সূচী

সখী

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে)

সখীর কার্য্য ও প্রয়োজনীয়তা

রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্বন্ধে মহাজনগণ বড় গলা করিয়া বলিয়াছেন, 'এমন পিরীতি না দেখি কখন, কখন হবার নয়', 'এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি, ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে,' 'এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই, জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারি যাই।' তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকেই আদর্শ ধরিয়া কথাটা প্যাড়িলাম। এই 'অদভুত প্রেমে'র সহায় ললিতা-বিশাখাদি অষ্ট সখী, বৃন্দা দূতী এবং আরও বহু অপ্রধানা সখীর কথা সকলেই জানেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি মহাজনের পদাবলীতে এবং 'ভক্তমাল,' 'চমৎকারচন্দ্রিকা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কবি-চিত্রকরদিগের নিপুণ তুলিকায় সখীদিগের প্রকৃতি ও কার্য্য উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়াছে।

নায়কের রূপগুণবর্ণন বা প্রতিকৃতি-চিত্রণ দ্বারা নায়িকার হৃদয়ক্ষেত্রে পূর্ব্বরাগের বীজবপন করিতে (১), 'পিরীতি

---

(১) 'শ্রবণন্তু ভবেত্তত্র দূতবন্দিসখীমুখাৎ।' শ্রবণাৎ। 'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।' দর্শনাৎ। 'বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া, বিশাখা দেখালে আনি।'

বেয়াধি'তে রোগ চিনিতে ও ঔষধের ব্যবস্থা করিতে (২), নায়কের বার্ত্তা লইতে ও নায়কের নিকট সংবাদ বহন করিতে, প্রেমলিপি লেখাইতে ও পৌঁছাইয়া দিতে, প্রিয়প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন করিতে, বাসক-সজ্জায় সজ্জিত করিতে ও মিলনের সহায়তা করিতে, হৃদয়নিধিকে নিভৃতে মিলাইতে, বিরহে প্রবোধ দিতে ও মিলনের উপায় উদ্ভাবন করিতে, মিলনে নর্ম্মালাপ ও আনন্দ-উৎসব করিতে, বিঘ্ন-ব্যাঘাত দূর করিতে, সখীরা সুনিপুণ। তাঁহারা সলাপরামর্শে সিদ্ধ-হস্ত, দূতীগিরিতে দড়। আর নায়িকা 'পরাণের সই' 'প্রাণ-স্বজনী'কে সুখের দুঃখের ভাগ দিয়া (৩), 'রজনী-আনন্দে'র রহস্য ও মরমের কথা প্রেমের ব্যথা জানাইয়া তৃপ্তা। সখীগণও শ্রীরাধার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, দরদের দরদী, মরমের মরমী।

'অদভুত হেরনু প্রিয়সখী প্রেম।
নিজ সখী দুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম॥'—গোবিন্দদাস
'প্রেমে সেবা করে সবে পরম উৎসাহে।
তাঁহার সুখের লাগি প্রাণ দিতে চাহে॥
শ্রীমতীর সুখের সুখী দুখের সে দুখী।
কিসে বা জন্মায় সুখ থাকিয়ে নিরখি॥'—
'ভক্তমাল', ২৬শ মালা।

(২) 'রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।' 'যতন করব হাম সেই কানু বৈছে তুয়া বশ হোই।'

(৩) 'শুন গো মরম সই।' 'সই মরম কহিয়ে তোকে।' 'কহে সুবদনী, শুন গো স্বজনী, দুখ কি বলিব আর।'

শ্রীরাধার অন্যতমা সখী ললিতার চিত্রে ইহার পরা কাষ্ঠা, চরম আদর্শ পাওয়া যায়। তিনি রাধাকৃষ্ণের মিলনসুখে তন্ময়-চিত্তা, পরমনির্বৃতা, কৃতার্থম্মন্যা।

'প্রিয়াপ্রিয়সখীমুখে তাম্বূল অর্পিয়া।
আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হিয়া॥'—

'ভক্তমাল' ৯ম মালা।

তাই শ্রীরাধাও আদর করিয়া বলিয়াছেন,—

'আমার ললিতা সখী রূপে গুণে শীলে।
এমন একটি নাহি ত্রিভুবনে মিলে॥'—

'ভক্তমাল' ২৬ মালা।

আদর্শ-হিসাবেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার দৃষ্টান্ত দিলাম; নতুবা, 'নায়িকা-সহায়িনী' সখী রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক সাহিত্যের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সকল দেশের কাব্য-নাটকেই নায়িকার এক বা একাধিক 'সমদুঃখ-সুখ সখীজনে'র ব্যবস্থা আছে। নায়িকার জীবনে সখীজনের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; কাব্য-নাটকে তাঁহাদিগের নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের স্থান নাই, তাঁহাদিগের নিজের প্রেমে পড়িবার অবসর নাই (৪), নায়িকার উত্তর-সাধিকার কার্য্যসাধনেই তাঁহাদিগের কার্য্য পর্য্যবসিত, তাঁহাদিগের জন্ম ও জীবন সার্থক। এই হিসাবে তাঁহাদিগকে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' বলিলেও বলিতে পারা যায়।

---

(৪) ব্রজলীলায় সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগিণী, অথচ শ্রীরাধার প্রতি এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যাদ্বেষ নাই, ইত্যাদি নিগূঢ় তত্ত্ব আছে।

[ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। তবে কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। কতকগুলি কাব্য-নাটকে নায়কের সহচর বা পরিচারকের সহিত নায়িকার সখীর প্রেম-সংঘটনের ব্যাপার আছে। 'মৃচ্ছকটিকে' নায়িকা বসন্তসেনার সখী মদনিকার শর্ব্বিলকের সহিত প্রণয় ও পরিণয় ঘটিয়াছে (তবে শর্ব্বিলক নায়ক চারুদত্তের সহচর বা অনুচর নহে)। শেক্‌স্‌পীয়ারের 'The Merchant of Venice'এ Gratiano-Nerissaর পরিণয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'তে গিরিজায়া-দিগ্‌বিজয়ের পরিণয় ও 'রাজসিংহে' নায়কের অনুরক্ত ভক্ত মাণিকলালের ও নায়িকার সখী নির্ম্মলকুমারীর পরিণয় ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী কমেডিতে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আরও দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'পরিবর্দ্ধিত' 'ইন্দিরা'য় সুভাষিণী ইন্দিরার সখীরূপেই কল্পিত, অথচ সুভাষিণীর পতিপ্রেম, সন্তানস্নেহ প্রভৃতির, অর্থাৎ তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের, চিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। আবার 'কপালকুণ্ডলা'য় নায়িকার ননদ শ্যামা ও 'বিষবৃক্ষে' নায়িকার ননদ কমলমণি ভাজের প্রিয়সখীবৃত্তি-সাধনের জন্যই সৃষ্ট, অথচ শ্যামার নিজস্ব সুখদুঃখের ক্ষুদ্র চিত্র ও কমলমণির ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের উজ্জ্বল চিত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা বিশেষ বিধি, সামান্য বিধি নহে।]

সখী ও দূতী সম্বন্ধে সংস্কৃতভাষার অলঙ্কারশাস্ত্রে যথেষ্ট আলোচনা আছে। 'দশরূপকে' 'নায়িকা-সহায়িন্যঃ' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য আছে—

দূত্যো দাসী সখী কারুর্ধাত্রেয়ী প্রতিবেশিকা।
লিঙ্গিনী শিল্পিনী স্বং চ নেতৃমিত্রগুণান্বিতাঃ ॥
দ্বিতীয় প্রকাশ, ২৯শ শ্লোক।

দর্পণকার আরও বিশদভাবে বলিয়াছেন—

লেখ্যসংস্থাপনৈঃ স্নিগ্ধৈর্বীক্ষিতৈর্মৃদুভাষিতৈঃ।
দূতীসম্প্রেষণৈর্নার্য্যা-ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে ॥
দূত্যঃ সখী নটী দাসী ধাত্রেয়ী প্রতিবেশিনী।
বালা প্রব্রজিতা কারুঃ শিল্পিন্যাদ্যাঃ স্বয়ং তথা ॥
কলাকৌশলমুৎসাহো ভক্তিশ্চিত্তজ্ঞতা স্মৃতিঃ।
মাধুর্য্যং নর্ম্মবিজ্ঞানং বাগ্মিতা চেতি তদ্‌গুণাঃ ॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৩০—৩২ শ্লোক।

নিসৃষ্টার্থো মিতার্থশ্চ তথা সন্দেশহারকঃ।
কার্য্যপ্রেষ্য স্ত্রিধা দূতো দূত্যশ্চাপি তথাবিধাঃ ॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৫৯ শ্লোক।

'রসমঞ্জরী'তে সংক্ষেপে সখী ও দূতীর লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী সখী। অস্যা মণ্ডনোপালম্ভশিক্ষা পরিহাস-প্রভৃতীনি কর্ম্মাণি ॥ দূত্যব্যাপার-পারঙ্গমা দূতী। তস্যাঃ সংঘট্টন-বিরহ-নিবেদনাদীনি কর্ম্মাণি ॥' অস্যার্থঃ—

'নায়িকার বিশ্বাস যে করে উৎপাদন,
সঙ্গে থেকে তোষে তারে সখী সেইজন;
নায়িকার প্রসাধন, মধুর ভর্ৎসন,
শিক্ষা-পরিহাস-আদি সখী-আচরণ ॥

দৌত্যকার্য্যে নিপুণা যে তারে দূতী কয়।
সংঘটন সংবাদাদি তার কার্য্য হয়॥' (৫)

কটমট সংস্কৃত-ভাষার অলঙ্কার-শাস্ত্রেই যে শুধু ইহার আলোচনা আছে তাহা নহে, দেশভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতেও ইহার প্রসঙ্গ আছে। কৌতূহলী পাঠক বিখ্যাত 'ভক্তমাল' গ্রন্থের ৯ম মালায় গোপীযূথ-আদিভেদ-প্রকরণে ও ২৬শ মালায় শ্রীকৃষ্ণলীলা-সহ শ্রীবৃন্দাবন-মহিমাবর্ণনে এবং ২৩শ মালায় রসপ্রকরণে সখী-গণের ও আপ্তদূতী পত্রহারী প্রভৃতির লক্ষণ ও কার্য্যের সরস বর্ণনায় প্রভূত জ্ঞান ও আনন্দলাভ করিবেন। ধরিতে গেলে, সখীর কার্য্য দূতীর কার্য্য অপেক্ষা উচ্চতর; কিন্তু দূতীরাও যখন সখীদিগের মতই 'বিশ্বাস-বিশ্রাম-কারিণী পার্শ্বচারিণী' এবং সখীরাও যখন প্রয়োজন হইলে দূতীর কার্য্য করিয়া থাকেন, তখন উভয়-শ্রেণীর প্রভেদের উপর তত জোর দিবার প্রয়োজন দেখি না।

[আবার কাব্য-নাটকে 'নায়িকা-সহায়িনী' সখীর অনুরূপ গুণবিশিষ্ট 'নেতৃমিত্র' অর্থাৎ নায়কের সখারও ব্যবস্থা আছে। রাধাকৃষ্ণলীলায় 'সুবল সাঙ্গাতি' ইহার সুবিদিত দৃষ্টান্ত। 'মালতীমাধবে' মাধবের সখা মকরন্দ, 'বাসবদত্তা'য় কন্দর্প-কেতুর সখা মকরন্দ, প্রেমগ্রস্ত নায়কের ব্যথার ব্যথী, নায়ক তাহাকে নব-অনুরাগের কথা বলিয়া স্বস্তি পান। শেক্স্পীয়ারের 'The Merchant of Venice' এ Bassanio সুহৃদ্বর

(৫) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহোদয়ের পদ্যানুবাদ। পাঠক-বর্গ ইচ্ছা করিলে ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'ও দেখিতে পারেন।

Antonioকে পূর্ব্বরাগ-বৃত্তান্ত বলিতেছেন, আবার তাঁহার প্রেমের তীর্থযাত্রায় Gratiano সাথী, অপ্রধান আখ্যানে Lorenzoর প্রণয়-ব্যাপারে Gratiano বিশ্বাসপাত্র ও সহায়। প্রেমিকপ্রবর রোমিও দুইবার প্রেমে পড়িয়াছিলেন, তাই বুঝি কবি তাঁহার দুইজন সমপ্রাণ সখার (Benvolio ও Mercutio) ব্যবস্থা করিয়াছেন! শেক্‌স্‌পীয়ারের 'The Two Gentlemen of Verona'য় ভ্যালেণ্টাইন্ প্রাণের বন্ধু প্রোটিয়াস্‌কে নিজের প্রেমের কাহিনী বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রোটিয়াস্ তাঁহার বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' রাজা মদনদেব পুরন্দর শ্রেষ্ঠীর সহায়; তবে পূর্ব্বরাগের আমলে নহে; শেষরক্ষার সময়ে। এই প্রসঙ্গে 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথ দত্তের কুন্দনন্দিনী-ঘটিত রূপজমোহ-ব্যাপারে বন্ধুবর হরদেব ঘোষালের সহিত পত্র-ব্যবহার স্মর্ত্তব্য। নায়ক নগেন্দ্র দত্তের হরদেব ঘোষালের ন্যায়, প্রতিনায়ক দেবেন্দ্র দত্তের 'সমবয়স্ক' 'মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র' একমাত্র হিতকামী সুহৃদ্, সুতরাং তিনি কুন্দঘটিত ব্যাপারে সহায়তা করেন নাই, বরং নিবৃত্ত করিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রেমের ব্যাপারে বহুস্থলে বিদূষক নায়কের বিশ্বাসপাত্র ও সহায়। 'সহায়াঃ বিটচেট-বিদূষকাদ্যাঃস্যুঃ।' রাধাকৃষ্ণলীলায় মধুমঙ্গল ইহার জের। ইংরেজী সাহিত্যে ও হালের বাঙ্গালা সাহিত্যে নায়িকার সখী দাসী-বাঁদীর ন্যায়, নায়কের প্রণয়-দূত, সন্দেশহারক—ভৃত্য বা খানসামা (সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের চেট ?)। শেক্‌স্‌পীয়ারের 'The Merchant of Venice' এর অপ্রধান আখ্যানে

Lorenzo-Jessicaর সন্দেশহারক Launcelot Gobbo এবং Cymbelineএ Posthumusএর বিশ্বস্ত ভৃত্য Pisanio এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী কমেডীতে প্রণয়দূত ভৃত্যের বহু উদাহরণ আছে। আমাদের সাহিত্যে 'মৃণালিনী'তে হেমচন্দ্রের ভৃত্য দিগ্‌বিজয় ইহার উদাহরণ। 'ছদ্মবেশ' প্রবন্ধে ('ভারতবর্ষ', ৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড) দেখাইয়াছি যে, নায়কের অনুরাগিণী নারী বহুস্থলে নায়কের বালক-ভৃত্যের ছদ্মবেশে নায়কের প্রণয়-পাত্রীর নিকট প্রণয়দূত সন্দেশহারকের কার্য্য করিয়াছে।]

কাব্য ও রসশাস্ত্রের জগৎ ছাড়িয়া বাস্তব-জগতের অর্থাৎ সাধারণ মানবসমাজের দিক্ হইতে কথাটার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজে 'কন্যাস্বজাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনা'র পূর্ব্বরাগের, বাসক-সজ্জা, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি অবস্থার, স্বয়ংবরার গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহের, অথবা স্বাধীনযৌবনার উদ্দাম প্রেমলীলার অবকাশ না থাকিলেও, আজও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কুলকন্যা ও কুলবধূদিগের সই, মিতিন, মনের কথা, মনামন, দেখন-হাসি, মকর, গঙ্গাজল, মহাপ্রসাদ, বেগুনফুল, আতর, গোলাপ, লেভেণ্ডার, ওডিকলম প্রভৃতি সমবয়স্কা প্রতিবেশিনী আছেন; তাঁহাদিগের কাছে সুখের দুঃখের কথা বলিয়া লজ্জাবতী কুলবতীরা হৃদয়ের ভার লঘু করিয়া তৃপ্তিবোধ করেন।

'জানালে আপন জনে মনের যাতনা।
ব্যথিত হৃদয় পায় অনেক সান্ত্বনা।'

—'নবীন তপস্বিনী', ৪র্থ অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক।

এইরূপ সমদুঃখসুখা সমবয়স্কা প্রতিবেশিনী সুখের সময় রঙ্গব্যঙ্গ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, আবার দুঃখে সান্ত্বনা ও সৎপরামর্শ দেন, অসময়ে সাহায্য ও শুশ্রূষা করেন, পতিপত্নীতে মনোমালিন্য ঘটিলে নারীসুলভ উপায়ে প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, ইত্যাদি। যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় দেখা যায়, শ্রীরাধা সখীদিগের কর্ণে রজনীবিলাসের কথা-মধু ঢালিয়া 'আনন্দ ওর' পাইতেছেন, তেমনি (realistic picture) বাস্তববর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, 'কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রসিকতার বিবরণ সখীদের কাণে কাণে বলিয়া' তৃপ্তি পাইতেছেন। ('বিষবৃক্ষ', ৯ম পরিচ্ছেদ।) আবার সহরে বড় বড় ঘরে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর পেয়ারের দাসী (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় খাস ঝী) থাকে, এই দাসীই মন্থরার ন্যায় মন্ত্রণাদায়িনী, আবার অসময়ে সান্ত্বনাদায়িনী। আর মনিব ঠাকুরাণীর 'প্রসাধন' অর্থাৎ সাবান মাখাইয়া গা ধোয়াইয়া চুল বাঁধিয়া টিপ পরাইয়া দেওয়া ত তাহার নিয়মিত কায। বিলাতী সমাজের Lady's maid বা femme-de-chambre ইহার সহিত তুলনীয়। অতএব দেখা গেল, এই শ্রেণীর পাত্রীগণ শুধু যে কাব্য-জগতের উপযোগী উপকরণ তাহা নহে, বাস্তব-জগতেও তাহাদিগের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে। আসল কথা, সাহিত্য সমাজের দর্পণ, সমাজে প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার সুসংস্কৃত অলঙ্কৃত বা idealised হইয়া কাব্যে স্থান পায়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু আদিরসের ব্যাপারেই সখীর কার্য্য পর্য্যবসিত নহে, সংসারের ছোট বড় সকল সুখদুঃখেই সখী সমবেদনাময়ী ও বিশ্বাসপাত্রী।

কাব্য-নাটকে সখীর দৃষ্টান্ত

যাক্, বাস্তবজগৎ ছাড়িয়া আবার কাব্যজগতে ফিরিয়া যাই। শুধু লৌকিক সাহিত্যে কেন, ধর্ম্মসাহিত্যেও দেখা যায়, দিব্য বা দিব্যাদিব্য নায়ক-নায়িকাদিগের প্রেমলীলায় এই অঙ্গ অপরিহার্য্য। রাধাকৃষ্ণলীলার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আবার শিবদুর্গার লীলাত্মক 'শিবায়ন' 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে দেখা যায়, ভগবতীর জয়া-বিজয়া যুগল-সখী আছেন; ঠাকুরের সঙ্গে ঠাকুরাণীর অকৌশল হইলে তাঁহারা নানাভাবে ঠাকুরাণীকে সাহায্য করিতে, সৎ-পরামর্শ দিতে, শান্ত বা উত্তেজিত করিতে, তৎপর।

লৌকিক সাহিত্যে দেখা যায়, কালিদাস-ভবভূতি, শ্রীহর্ষ-বাণভট্ট প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য-নাটকেও এই ব্যবস্থা বাহাল আছে। মহাভারতের শকুন্তলা একাই এক শ', প্রগল্‌ভা নায়িকা, বাহাদুর মেয়ে; তিনি অম্লানবদনে দুষ্মন্তের নিকট নিজের জন্মবৃত্তান্ত খোলসা করিয়া বলিলেন, এবং নিজের গর্ভজাত পুত্র রাজা হইবে দুষ্মন্তের সহিত এই সর্ত্ত আঁটিয়া তবে গান্ধর্ব্ববিবাহে রাজী হইলেন; এমন প্রবলা অবলার সখীর সহায়তার প্রয়োজন নাই; কিন্তু কালিদাসের ব্রীড়াবতী শকুন্তলার যুগলসখী আছে। আর্য-রামায়ণে জনমদুঃখিনী সীতার সখী নাই, কিন্তু শ্রীকণ্ঠ-পদলাঞ্ছন ভবভূতি ও মাইকেল-পদলাঞ্ছন মধুসূদন করুণা-পরবশ হইয়া তাঁহার দুঃখের ভাগ লইবার জন্য (বাসন্তী ও 'হিতৈষিণী পরমা সখী' সরমা) সমবেদনাময়ী সখীর

সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ উর্ব্বশীর চিত্ররেখা আছে, মালবিকার বকুলাবলিকা আছে, সাগরিকার সুসঙ্গতা আছে, মালতীর 'ধাত্রেয়ী পরমার্থভগিনী প্রিয়সখী' লবঙ্গিকা আছে, বসন্তসেনার মদনিকা আছে, 'নাগানন্দে' মলয়বতীর চতুরিকা আছে, বাণরাজকন্যা উষার চিত্রলেখা আছে, কাদম্বরীর তরলিকা আছে, সুবন্ধুর বাসবদত্তার তমালিকা আছে, সে নায়িকার উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য নায়িকার স্বপ্নদৃষ্ট নায়কের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।

প্রতীচীর শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে দেখা যায়, মিশরসুন্দরী ক্লিওপেট্রার (কালিদাসের শকুন্তলার ন্যায়) যুগল-সহচরী চার্ম্মিয়ান্ ও আইরাস্ আছে; পোর্শিয়ার সহচরী নেরিসা আছে, ('The Two Gentlemen of Verona'য়) জুলিয়ার সহচরী লুসেটা আছে, ('Henry V'এ) ফরাসী রাজকুমারী ক্যাথারিনের নর্ম্মসখী Alice আছে, ডেস্‌ডেমোনার পার্শ্বচারিণী এমিলিয়া আছে, ('The Winter's Tale'এ) হার্ম্মিওনির দুঃখের দিনে শুভানুধ্যায়িনী সমবেদনাময়ী পলিনা আছেন, Coriolanus এর পত্নী কোমলপ্রকৃতি ভার্জ্জিলিয়ার ভ্যালেরিয়া সখী আছেন (ইহা ছাড়া স্নেহময়ী শ্বশ্রূও তাঁহার হৃদয়ে বল দিতেছেন); হার্ম্মিয়া-হেলেনা সমবয়স্কা সহপাঠিনীদিগের ছেলেবেলা হইতে গলায় গলায় ভাব ছিল, তাহারা প্রাণের কথাটি পরস্পরকে না বলিয়া কখনও স্বস্তিবোধ করিত না; শেষে কন্দর্প-ঠাকুরের ও পরীরাজ্যের বিদূষকের খেয়ালে তাহারা প্রেমের পথে প্রতিযোগিনী হইলে সে অনুপম সখ্যরস ঈর্ষ্যাদুষ্ট বিকৃত হইয়াছিল। এই অব-

ন্যায় হেলেনার অনুযোগবাক্যগুলি হইতে তাহাদের পূর্ব্ব-সখীত্বের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।——

'Is all the counsel that we two have shared,
The sister's vows, the hours that we have spent,
When we have chid the hasty-footed time
For parting us,—O, is it all forgot ?
All school-days' friendship, childhood innocence ?
We, Hermia, like two artificial gods,
Have with our needles created both one flower,
Both on one sampler, sitting on one cushion,
Both warbling of one song, both in one key,
As if our hands, our sides, voices and minds ;
Had been incorporate. So we grew together,
Like to a double cherry, seeming parted,
But yet an union in partition ;
Two lovely berries moulded on one stem ;
So, with two seeming bodies, but one heart.'

A Midsummer Night's Dream, Act III Sc. ii.

'বোনে বোনে' প্রবন্ধে (লেখকের 'কাব্যসুধা' ৪০—৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বলিয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন কোন স্থলে সখীর পরিবর্ত্তে স্নেহময়ী ভগিনী, ননন্দা বা সপত্নীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারাও সখীস্থানীয়া। (শেক্‌স্‌পীয়ারের কয়েকখানি

নাটকে ভগিনীর সখীত্বের সুন্দর চিত্র আছে, উক্ত প্রবন্ধে তাহাও প্রাসঙ্গিক-ভাবে দেখাইয়াছি।) উল্লিখিত প্রবন্ধে ইহাও বুঝাইয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে নায়িকা অনূঢ়া হইলে সখীর ব্যবস্থা, বিবাহিতা হইলে বোন, ননদ, সতীন প্রভৃতি আত্মীয়াদিগের সখীত্বের ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও বিবাহিতার বেলায়ও সখীর ব্যবস্থা আছে; এই ব্যতিক্রমের কারণও উক্ত প্রবন্ধে দর্শাইয়াছি।

অবশ্য, সর্ব্বত্র যে নায়িকার সখী বা সখীস্থানীয়া ভগিনী, ননন্দা প্রভৃতি আত্মীয়ার অবতারণা করিতে হইবে এমন কোন মাথার দিব্য দেওয়া নাই। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নাই, সে সকল ক্ষেত্রে একটু তলাইয়া দেখিলে এরূপ ব্যবস্থা না থাকার সঙ্গত কারণও ধরা পড়ে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেখি, হিমালয়-কন্যা গৌরীর নর্ম্মসখীর অপ্রতুল নাই, কিন্তু দক্ষকন্যা সতীর সখী নাই; ইহাতেই পিতৃবিড়ম্বিতা পতিপ্রাণা সতীর পতি-নিন্দা-শ্রবণে প্রাণত্যাগের অরুন্তুদ করুণরস (tragic pathos) আরও ঘনীভূত হইয়াছে, নিদারুণ বিয়োগান্ত শোককাব্য আরও জমাট বাঁধিয়াছে। এইরূপ অবিচলিত-পতিভক্তিমতী সীতা-সাবিত্রীর রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদিতে এবং সমশ্রেণীর নায়িকা বেহুলার প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে সমবেদনাময়ী সখীর সমাগম নাই। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যে দানববালা মেঘনাদ-জায়া প্রমীলার নৃমুণ্ডমালিনী সখী আছে, কিন্তু মহাভারতের ক্ষাত্র-তেজোদৃপ্তা দ্রুপদ-দুহিতা যাজ্ঞসেনীর সখী নাই। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকেও দেখা যায় যে, ভাগ্যবিপর্য্যয়ের নিদারুণ করুণরস ঘনীভূত

করিবার জন্য কবি কোর্ডিলিয়া-জুলিয়েট-ওফিলিয়াকে সখীভাগ্যে বঞ্চিত করিয়াছেন। কোর্ডিলিয়ার ভগিনীদ্বয়ের ঈর্ষ্যাদুষ্ট ও নীচ স্বার্থপর ক্রূর ব্যবহার, জুলিয়েটের ধাই-মার স্থূল গ্রাম্য রসিকতা ও জঘন্য বিষয়বুদ্ধি এবং ওফিলিয়ার প্রতি পিতা ও ভ্রাতার মুরুব্বিয়ানা ও উপদেশবাণ-নিক্ষেপ তাহাদিগের নিদারুণ কাহিনীকে আরও নিদারুণ করিয়া তুলিয়াছে। স্বামিময়জীবিতা আইমোজেনের রাজকন্যার উপযুক্ত lady-in-waiting আছে, কিন্তু তাঁহার যত কিছু সুখ-দুঃখের কথা, যত কিছু পরামর্শ, স্বামীর বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত। আবার লঘুপ্রকৃতি ভীনাস্, হেলেন্, ক্রেসিডা ও হেম্‌লেট্-জননীর সখী নাই। প্রকৃতি-দুহিতা মিরাণ্ডা-পার্ডিটার 'রঙ্গিনী সঙ্গিনী' থাকিতে পারে না। উগ্রচণ্ডা ক্যাথারিন্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লেডি ম্যাক্‌বেথ্, দানবী Goneril Regan, বীরনারী হিপোলাইটা, রোম্যান মেট্রনের আদর্শ Cato's daughter, Brutus' Portia, ও লুক্রিস্ (৬), সংযমশীলা ধর্ম্মপ্রাণা ইজাবেলা, আত্মসমাহিতা ভায়োলা,—ইহাদের কাহারও সখী নাই, থাকিতে পারে না, থাকিবার প্রয়োজন ও উপযোগিতা নাই। ইহার সাধারণ সূত্র এইভাবে বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে।—যে সকল

---

(৬) লুক্রিসের পরিচারিকা আছে, সে তাঁহার সর্ব্বনাশের পর তাঁহার বিবর্ণ অশ্রুপ্লুত মুখ দেখিয়া সমবেদনায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছে এবং তাঁহার মর্ম্মান্তিক বেদনার কারণ জানিতে চাহিয়াছে; কিন্তু লুক্রিস্ তাহাকে সেই মর্ম্মান্তিক বেদনার, সেই অকথ্য অত্যাচারের কথা বলেন নাই। সুতরাং পরিচারিকা 'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী সখী' নহে।

নায়িকার সখীর ব্যবস্থা নাই, তাহারা হয় গম্ভীরা দৃঢ়প্রকৃতি আত্মসমাহিতা আত্মবলে নির্ভরক্ষমা, না হয় নিতান্ত লঘুপ্রকৃতি, সখ্যবন্ধনের, গভীর প্রীতি-অনুভবের অনুপযুক্তা। এই উভয় শ্রেণীর নায়িকার সখীর ব্যবস্থা করিলে তাহাদিগের চরিত্রের অঙ্গহানি হইত, অসঙ্গতি ঘটিত (৭)। ইহা ছাড়া, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিদারুণ করুণরস ঘনীভূত করিবার উদ্দেশ্যেও কবিগণ নায়িকাকে একাকিনী অসহায়া সখীভাগ্যহীনা করিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে নির্দ্দিষ্ট মূলসূত্র ধরিয়া বিচার করিলে আমরা

---

(৭) এক্ষেত্রে লেডি ম্যাক্‌বেথ্ সম্বন্ধে Mrs. Jamesonএর মন্তব্য স্মর্ত্তব্য।—

"To have given her a confidante would have been a degrading resource and have disappointed and enfeebled all our previous impression of her character."

একজন ইংরেজ আখ্যায়িকা-কারের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য একটু বেশী কঠোর।—

"There are some moments in life in which both men and women feel themselves imperatively called on to make a confidence......There are people of both sexes who never make confidences......but such are generally dull, close, unimpassioned spirits, gloomy Gnomes, who live in cold dark mines."

Anthony Trollope : *Barchester Towers. Ch. 41.*

বুঝিতে পারিব, কিজন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে আত্ম-সমাহিতা আয়েষার, আত্মনির্ভরক্ষমা সদাহাস্তময়ী ললিতলবঙ্গলতার (৮) সখীর প্রয়োজন নাই, জাঁহাবাজ ও রাশভারী রোহিণীর (৯), ঐশ্বর্য্যদৃপ্তা ভোগ-সুখনিরতা জেবউন্নিসার (১০), সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিতা বিলাসবাসনাপূরিতা সুরামত্তা উদিপুরীর সখীর প্রয়োজন নাই, ধর্ম্মপ্রাণা পতিদেবতা কল্যাণী বা নন্দার সখীর প্রয়োজন নাই। সখীর সমবেদনা, সাহচর্য্য ও সাহায্যের অভাবে অন্ধ যুবতী রজনীর

(৮) গ্রন্থকার অমরনাথের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—'ললিতলবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান্ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি! আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি। অথচ, আমি জানি; লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।'—'রজনী', ৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ, অমরনাথের কথা! অমরনাথের প্রদত্ত এই সার্টিফিকেট সত্ত্বেও কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে দুইতিনটি স্থলে ললিতলবঙ্গলতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ সংযম হারাইয়াছে। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্ম।

(৯) 'রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চালচলনও ভারি।'—'কৃষ্ণকান্তের উইল', প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(১০) তাঁহার দর্পচূর্ণ হইলে চঞ্চলকুমারী মবারকের সহিত তাঁহার মিলন সংঘটন করিয়া দিয়া সখীর কার্য্য করিয়াছেন। 'রাজসিংহ,' ৮ম খণ্ড ৪র্থ ৫ম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এবং মনোরমা, কুন্দনন্দিনী (১১) ও দরিয়ার (১২) জীবনকাব্য করুণভাবে ফুটিয়াছে। রামসদয় মিত্রের প্রথম পক্ষ 'তুয়া' ভুবনেশ্বরীকে গ্রন্থকার এমন অবহেলা করিয়া back-groundএ ফেলিয়াছেন যে, তাহার জন্য একটা 'দুর্ব্বলা দাসী'র পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করেন নাই।

(১১) বঙ্কিমচন্দ্র 'মন্দভাগিনী চিরদুঃখিনী' কুন্দনন্দিনীকে একেবারে সখীভাগ্যে বঞ্চিত করেন নাই। বাল্যে পিতৃবিয়োগের পরেই তাহার 'সমবয়স্কা ও সঙ্গিনী' চাঁপাকে তাহার পার্শ্বে বসাইয়াছেন। চাঁপা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, কুন্দও তাহাকে অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়াছে। (৪র্থ পরিচ্ছেদ)। যৌবনে কোনও কোনও সময়ে কমলমণি তাহাকে স্নেহবাক্য বলিয়াছেন। (২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) তথাপি বলিতে হইবে, যৌবনে তাহার গভীর মনোবেদনায় শান্তি দিবার জন্য সমবেদনাময়ী সখী নাই। হীরার দিন কতকের জন্য কপট ভালবাসা অবশ্য সখীত্ব নহে। (২১-২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

(১২) দরিয়ার প্রতিবেশিনী ফতেমা বিবি ও 'জ্যেষ্ঠা ভগিনী আর একটা বুড়ী ফুফু কি খালা'—ইহাদের কাহারও কাছে সে মনের বেদনা প্রকাশ করে নাই। ('রাজসিংহ' ১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ)। সে আত্মনির্ভরক্ষমা, এজন্যও তাহার সখীর প্রয়োজন হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত সখীবৃন্দ

এইবার 'নেতি নেতি' ছাড়িয়া দেখা যাউক, কোথায় কোথায় বঙ্কিমচন্দ্র আবহমানকাল-প্রচলিত প্রাচীন পন্থার অনুসরণ করিয়া নায়িকা প্রতিনায়িকা প্রভৃতির সখীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে শৈলেশ্বর-মন্দিরে নায়ক কুমার জগৎসিংহ নায়িকা তিলোত্তমার সমভিব্যাহারিণী 'বাগ্‌বিদগ্ধা বয়োঽধিকা' বিমলাকে দেখিয়া 'বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন; অথচ সচরাচর দাসীর অপেক্ষা সম্পন্না।' পাঠকও যদি সেইরূপ ধারণা করেন, তাহা হইলে অসঙ্গত হয় না, কেন-না আখ্যায়িকার প্রথম খণ্ডে বিমলার আচরণ এই শ্রেণীর সখীর ন্যায়। নায়ক-নায়িকার চারি চক্ষুঃ সংমিলিত হইলে তিনি পরিহাস করিলেন, 'কি লো! শিবসাক্ষাৎ স্বয়ংবরা হবি না কি?' পরে তিনি তিলোত্তমার পূর্ব্বরাগ-লক্ষণ দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা হইলেন। সরলা বালিকার সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝা যায় যে তিনি ব্যথার ব্যথী। তাহার পর তিনি তিলোত্তমার দূতী সাজিয়া জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অন্যের অজ্ঞাতে প্রেমিক-প্রেমিকার নিভৃতে মিলন ঘটাইয়া দিলেন। 'তিনি গতিকে মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছেন' বলিয়া 'তাঁহার মুখ অতি হর্ষপ্রফুল্ল'; আবার তিনি 'কৌতূহল-প্রযুক্ত দ্বারমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র রন্ধ্র হইতে গোপনে তিলোত্তমার ও

রাজকুমারের ভাব দেখিতে লাগিলেন।' এ সকলই শ্রীরাধার ললিতা-সখী ও বৃন্দা-দূতীর ন্যায়। তিনি তিলোত্তমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহশালিনী ও তাহার হিতকামা। যাহা হউক, পরে নায়িকা ও পাঠক জানিলেন যে, বিমলা প্রকৃতপক্ষে তিলোত্তমার বিমাতা, কোনও গুরুতর কারণে 'পরিচারিকা' বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। সুতরাং বিমলার সখীত্বকে বিমাতৃ-স্নেহের উজ্জ্বল চিত্র-হিসাবে 'সতীন ও সৎমা' প্রবন্ধে [illegible] করিয়াছি। (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক [illegible])

আবার পূর্ব্বকথা ('[illegible]' [illegible] পরিচ্ছেদ) হইতে জানা যায় যে, বিমলা এক সময়ে [illegible] অন্যতমা মহিষী উর্ম্মিলা দেবীর 'সহচারিণী' ছিলেন; তবে তিনি উর্ম্মিলা দেবীর পতিপ্রেমে সখীর ন্যায় সহায়তা করেন নাই, উর্ম্মিলা-সখীই তাঁহার গুপ্তপ্রণয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময়ে আসমানি বিমলার পত্রহারী বা সন্দেশহারিকা দূতীর কার্য্য করিয়াছে এবং প্রেমিক বীরেন্দ্রসিংহকে বারিবাহক দাসের ছদ্মবেশে প্রেমিকার নিকট নিভৃতে মিলাইয়াছে।

আর এক কথা। তিলোত্তমা যখন কারাগারে জগৎসিংহের রূঢ় ব্যবহারে মূর্চ্ছাগতা, তখন আয়েষা জগৎসিংহের আহ্বানে তথায় আসিয়া তিলোত্তমার পরিচয় পাইয়া, শ্রীরাধার সখীজনের ন্যায়, 'তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া বসিলেন। আর কেহ কোনরূপ সঙ্কোচ করিতে পারিত; সাত পাঁচ ভাবিত, আয়েষা একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।' ইত্যাদি (২য় খণ্ড ১৪শ

পরিচ্ছেদ)। এ ক্ষেত্রে তাঁহার আচরণ সমবেদনাময়ী সখীর ন্যায়। কবি এই ব্যাপারে 'চমৎকার-কারিণী পরহিত-মূর্ত্তিমতী' আয়েষার করুণা, উদারতা ও ঈর্ষ্যাহীনতার পরিচয় দিয়াছেন।

'কপালকুণ্ডলা'র নায়িকা কপালকুণ্ডলা কুমারী-জীবনে হিজলীর জঙ্গলে মিরাণ্ডার ন্যায় সঙ্গিনীহীনা ছিলেন, ইহাই প্রকৃতি-দুহিতার উপযোগী। কিন্তু বিবাহিত-জীবনে সপ্তগ্রামে তিনি স্নেহময়ী ননন্দা শ্যামার সহিত সখীত্বসূত্রে আবদ্ধা। এই সখীত্বের আলোচনা 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে করিয়াছি। (লেখকের 'কাব্যসুধা' পুস্তক দ্রষ্টব্য।) প্রতিনায়িকা লুৎফউন্নিসার জীবনকাব্য যখন ঘোরালো হইয়া আসিল, তখন তাঁহার পার্শ্বে বাঁদী পেষমনকে দেখিতে পাই। আবার তিনি ও মিহরুন্নিসা 'বাল্যসখী' ছিলেন। আবার লুৎফউন্নিসা, রাজপুতপতি রাজা মানসিংহের ভগিনী 'যুবরাজ সেলিমের প্রধানা মহিষী' শ্বশ্রূজননীর 'প্রধানা সহচরী' ছিলেন। তবে সম্পর্কটা ঠিক উর্ম্মিলাদেবীর সহিত বিমলার সম্পর্কের অনুরূপ নহে। 'লুৎফউন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।' (৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।) যাহা হউক, এরূপ সম্পর্ক-সত্ত্বেও রাজনীতির ষড়যন্ত্রে তিনি বেগমের সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিলেন, তবে সে 'আত্মপ্রাধান্য-রক্ষার জন্য।'

মৃণালিনীর সখীভাগ্য শকুন্তলা-ক্লিওপেট্রা অপেক্ষাও সুপ্রসন্ন। তাঁহার তিন সখী—মণিমালিনী, গিরিজায়া ও রত্নময়ী, তবে ঠিক সমকালে নহে। ইহা ছাড়া পিতৃগৃহে গুপ্তপ্রণয়-ব্যাপারে

'দূতী' ছিল। এই দূতীই মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে হেমচন্দ্রের সঙ্কেত-আঙ্গটি আনিয়াছিল (৩য় খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ)। একবার, ধাত্রীমাত্র (১৩) সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে হেমচন্দ্রের সহিত তিনি গোপনে মিলিত হইয়াছিলেন। আবার তিনি নিজে মথুরার রাজকন্যার সখী ছিলেন (৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ)। তাঁহার সহিত জলবিহার করিতে গিয়াই মৃণালিনী জলমগ্ন হইয়াছিলেন ও উদ্ধারকর্ত্তা হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর অন্যোন্যানুরাগ হইয়াছিল।

'বিষবৃক্ষে' নায়িকা সূর্য্যমুখীর স্নেহময়ী ননন্দা কমলমণি সখীর ন্যায় সমবেদনাময়ী। এই চিত্রের বিচার ('কাব্যসুধা' পুস্তকে) 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে করিয়াছি। প্রতিনায়িকা কুন্দনন্দিনীর বাল্যসখী চাঁপার কথা ও মন্দভাগিনীর যৌবনকালে কখনও কখনও কমলমণির সমবেদনার কথা ১৭শ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি। হীরা দাসী সূর্য্যমুখী-কর্ত্তৃক কুন্দর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল বটে (৭ম পরিচ্ছেদ), নিজ বাটীতে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল তাহাও বটে (১৮ পরিচ্ছেদ); দিনকতক যত্ন আদর করিয়াছিল তাহাও বটে, কিন্তু ইহা 'ডাইনের মায়া'; গিরি-জায়ার মত সমবেদনা নহে। তাহার মনোগত ঈর্ষ্যা ও কুটিলতা পাঠকের অবিদিত নাই। (২০শ, ৩৩শ ও ৪৭শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(১৩) সাহিত্যদর্পণে 'ধাত্রেয়ী' নায়িকা-সহায়িনী হইবার কথা আছে। ('মালতীমাধবে' উদাহরণও আছে), ধাত্রীর কথা নাই। তবে জুলিয়েটের ধাত্রী স্মর্ত্তব্য। ইহা ইতালীয় সমাজের বর্ষীয়সী duennaর জের।

সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পরে সে কুন্দর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল (৩২শ পরিচ্ছেদ)। শেষে সে কুন্দকে বিষ খাইতে প্রবৃত্তি দিল ও বিষের মোড়ক তাহার হাতের কাছে রাখিল। অতএব 'অসামান্যা সরলা' কুন্দ তাহাকে প্রিয়বাদিনী ও আজ্ঞাকারিণী (৪৭শ পরিচ্ছেদ) এবং 'বিশ্বাসভাগিনী' বিবেচনা করিলেও পাঠকবর্গ তাহাকে অবশ্য সমদুঃখসুখা 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী সখী' মনে করিবেন না। কুন্দর কষ্টে তাহার আনন্দ।

হীরার 'গঙ্গাজল' মালতী গোয়ালিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য!

'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর দূর-সম্পর্কীয়া ননন্দা সুন্দরী সখী-স্থানীয়া। এই চিত্রের বিচার ('কাব্যসুধা' পুস্তকে) 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে করিয়াছি।

দলনীর পরিচারিকা কুলসম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'রজনী'তে সখীর বালাই নাই। পূর্ব্বেই (১৬-১৭ পৃঃ) তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের দুঃখের দিনে জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী সখীস্থানীয়া। এই চিত্রের বিচার ('কাব্যসুধা' পুস্তকে) 'বোনে বোনে' প্রবন্ধে করিয়াছি। সুখের দিনে ভ্রমরের কেন সখী নাই, সে কথার বিচারও উক্ত প্রবন্ধে করিয়াছি। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।—"ভ্রমরের সুখের দিনে, স্বামি-সৌভাগ্যের দিনে, সখীর প্রয়োজন হয় নাই—গোবিন্দলালের প্রগাঢ় প্রণয়ে তাঁহার হৃদয় এমন ভরপূর যে, তিনি সখীর

অভাব অনুভব করেন না, ননদের সহিত মাখামাখিরও প্রয়োজন বুঝেন না। এইটুকু বুঝাইবার জন্য কবি ভ্রমরের সুখের দিনে সখী প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন নাই। (যেমন ভবভূতি সীতার সুখের দিনে বাসন্তী সখীর ব্যবস্থা করেন নাই, কারণ তখন সমদুঃখসুখা সখীর প্রয়োজন নাই)।"

ভ্রমরের প্রসঙ্গে ক্ষীরি চাকরানী উল্লেখযোগ্য।

'পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত' 'ইন্দিরা'র ইন্দিরার সুখের দিনে কনিষ্ঠা ভগিনী কামিনী সখীস্থানীয়া। এই চিত্রের বিচার ('কাব্য-সুধা' পুস্তকে) 'বোনে বোনে' প্রবন্ধে করিয়াছি। ইন্দিরার দুঃখের দিনে অর্থাৎ সে "যখন পিতৃগৃহ ও পতিগৃহ হইতে চ্যুতা, প্রবাসিনী পরান্নজীবিনী পরাবসথশায়িনী, স্বামীর সহিত মিলনের আশা সুদূরপরাহত, তখন সেই দুর্দ্দিনে স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী সতত শুভানুধ্যায়িনী সখী সুভাষিণী তাহার সান্ত্বনাদায়িনী ও পরমসহায়।" ('বোনে বোনে' প্রবন্ধ।) সুভাষিণীর সখীত্ব এই আখ্যায়িকায় উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। তাহারই (prelude) সূচনা-স্বরূপ অমলা-নির্ম্মলা বালিকাদ্বয়ের সখীত্বের ক্ষুদ্র চিত্র গ্রন্থের প্রথম ভাগে (৫ম পরিচ্ছেদে) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দাসী হারাণী একটিবার পত্রহারী দূতীর কার্য্য করিয়াছে (১২শ পরিচ্ছেদ), ইহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'যুগলাঙ্গুরীয়ে' নায়িকা হিরণ্ময়ীর 'প্রতিবাসিনী অমলা নামে গোপকন্যা' উল্লেখযোগ্য।

'রাধারাণী'তে বসন্তকুমারীর সখীত্ব পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা'র

সুভাষিণীর সখীত্বের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। আর দাসী চিত্রা যথাসময়ে শাঁকে ফুঁ দিয়াছে (৮ম পরিচ্ছেদ)। ইহাতে শ্রীরাধার ললিতা-সখীকে একটু একটু মনে পড়ে না কি ?

'আনন্দমঠে' শান্তির গার্হস্থ্য-জীবনে স্নেহময়ী ননন্দা নিমাই সখীস্থানীয়া। সে শান্তির দুঃখে সমবেদনা দেখাইয়াছে, পতির সহিত শান্তির মিলন সংঘটন করিয়াছে, মিলনান্তে তাহার সুখে সুখবোধ করিয়াছে, নর্ম্মালাপ করিয়াছে, সকলই সখীর কার্য্য। এই চিত্রের বিচার ('কাব্যসুধা' পুস্তকে) 'ননদভাজ' প্রবন্ধে করিয়াছি। পরে শান্তির জীবনে যে মহা-পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাহাতে আর তাহার সখীর প্রয়োজন হয় নাই, তখন সে স্বামীর সহিত একাত্মতাবন্ধনে মিশিয়াছে।

'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রফুল্লর স্বামি-সন্দর্শনে জন্ম সার্থক করাইয়া অসূয়াশূন্যা সমবেদনাময়ী সপত্নী সাগর সখীর কার্য্য করিয়াছে। আবার প্রফুল্ল পরে সাগরের মানভঞ্জনে, ব্রজেশ্বর-কর্ত্তৃক সাগরের চরণ-সংবাহনে, সহায়তা করিয়া প্রিয়সখীর কার্য্য করিয়াছে। ('দেহি পদপল্লবমুদারম্' এর আর বাকী রহিল কি ?) এই সপত্নীচিত্রের বিচার 'সতীন ও সৎমা' প্রবন্ধে করিয়াছি। (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২১)। আর দেবী চৌধুরাণীর উত্তরজীবনে যুগলসখী নিশি ও দিবা।

'সীতারামে' দেবী চৌধুরাণীর স্থানীয়া শ্রীর যুগল-সখীর স্থলে এক সখী—সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী। আর রমার স্নেহময়ী সপত্নী নন্দা সখীস্থানীয়া। এই চিত্রের বিচার 'সতীন ও

সংযমা' প্রবন্ধে করিয়াছি। যদিও বিচার-শেষে রমা মূর্চ্ছিতা হইলে তাহাকে 'সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল' এইরূপ গ্রন্থকারের উক্তি আছে বটে (৩য় খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ), তথাপি নন্দাই রমার প্রকৃত সখী। বিপৎকালে সমবেদনা দেখাইয়া ও সৎপরামর্শ দিয়া, পতিকে রমার অনুকূল করিয়া, রমার কলঙ্কভঞ্জনে সবিশেষ সহায়তা করিয়া, রমার মরণকালে পতির সহিত তাহার মিলন-সংঘটন করিয়া, নন্দা প্রকৃত হিতৈষিণী সখীর কার্য্য করিয়াছেন।

দাসী মুরলাকে লোকে রমার 'দূতী' মনে করিয়াছিল এবং পাঁচকড়ির মা শ্রীকে বিপৎকালে তাহার স্বামি-সন্দর্শনে সহায়তা করিয়াছিল, এই দুইটি উদাহরণও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য।

'পুনঃ-প্রণীত' 'রাজসিংহে' রূপনগরের রাজকন্যা নায়িকা চঞ্চলকুমারীর সখী নির্ম্মলকুমারী সখীকুলশিরোমণি।

যোধপুরী বেগমের বিশ্বাসপাত্রী দেবী চাকরানীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (১৪)।

ক্রমশঃ এই সখীবৃন্দের শ্রেণীভেদে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

(১৪) ক্ষীরি চাকরানী, দেবী চাকরানী প্রভৃতিকে কেন এই শ্রেণীভুক্ত করিলাম, তাহার কৈফিয়ত 'সখীগণের শ্রেণীবিভাগ' পরিচ্ছেদে দিব।

সখীগণের শ্রেণীবিভাগ।

দর্পণকার নায়িকাদিগের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ করিয়া সখীদিগের বেলায়—'এতা অপি যথোচিত্যাদুত্তমাধমমধ্যমাঃ' বলিয়া পরিশ্রম বাঁচাইয়াছেন। ভগিনী, ননন্দা, যাতা, ভ্রাতৃজায়া, সপত্নী প্রভৃতি আত্মীয়াগণের সখীত্বের কথা সংস্কৃতভাষার সাহিত্যে, তথা অলঙ্কার-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আত্মীয়াদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, নানা দেশের সাহিত্যে সখীজনের যে সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, অভিনিবেশপূর্ব্বক সেগুলির আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে ফেলা যায়। জানি না, এই তিন শ্রেণীই দর্পণকারের 'উত্তমাধমমধ্যমাঃ' কি না।

(১) প্রথম শ্রেণীর সখী বৃত্তিভোগিনী সহচরী নহেন, নায়িকার ন্যায়ই স্বাধীনা, অনেক সময়ে সামাজিক পদবীতে নায়িকা অপেক্ষা ন্যূন নহেন (যদিও সামাজিক পদবীতে ন্যূন হইলেও সখীত্ব ঘটিবার কোন বাধা নাই)। সাধারণতঃ তিনি প্রতিবেশিনী। (সাহিত্যদর্পণে 'প্রতিবেশিনী' ও দশরূপকে 'প্রতি-বেশিকা'র উল্লেখ আছে)। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে সই, মিতিন, মকর, গঙ্গাজল প্রভৃতি ইহার সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। শ্রীরাধার সখীগণ এই শ্রেণীভুক্ত। অধিকাংশ কাব্য আদিরসপ্রধান; সুতরাং প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্যই সখীজনের অবতারণা; কিন্তু অন্যান্য রসের স্থলেও সখীজনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুকুন্দরামের 'চণ্ডী'তে দেখা যায়, ব্যাধ-রমণী ফুল্লরা দারিদ্র্যের পীড়নে 'সই বিমলার মাতা'র নিকট চাউল ধার করিতে গেল, দেখা হইলে দুই সই কোলাকুলি করিল,

"আশ্বাসিয়া আইস আইস বলে তারে সই।
এতদিন দেখা নাই গিয়াছিলে কই॥
* * * *
শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী।
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী॥
আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি।
বসিতে আসন দিল চৌখণ্ডিয়া পীড়ি॥
* * * *
আইস পরাণের সই বইস ভগিনী।
মোর মাথার গোটা দুই দেখহ উকুনি॥
দুহে বসি কথায় মজিয়া গেল চিত।"

ইহা পল্লীনারীর সখীত্বের বিশদ বাস্তব (realistic) চিত্র। আবার উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় আখ্যানে, সদাগর-পত্নী লহনা সতীনকাঁটার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সই 'লীলাবতী ব্রাহ্মণী'র শরণ লইয়াছেন; সেখানেও 'দুই সইয়ে কোলাকুলি দোঁহে আলিঙ্গন'; লীলাবতী ব্রাহ্মণীর অনেক 'গুণজ্ঞান' ছিল, তিনি লহনাকে 'আশ্বাস' দিলেন ও তাহার বিপদ্ উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন।

শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে হার্ম্মিয়া-হেলেনা এই শ্রেণীর সুন্দর দৃষ্টান্ত, পূর্ব্বে (১১-১২ পৃঃ) এ কথা বলিয়াছি। স্কটের Guy

Mannering এ Julia Mannering এর সখী Matilda Marchmont সহপাঠিনী ছিল। Julia পত্র দ্বারা তাহাকে প্রেমের ঘটনা জানাইতেছে। স্কটের চিত্র হার্ম্মিয়া-হেলেনার চিত্রের মত উজ্জ্বল না হইলেও এই শ্রেণীর বটে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বড় দিদি'তে নায়িকা মাধবী দেবী ও তাঁহার সখী মনোরমার পত্র-ব্যবহার এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য। 'The Winter's Tale'এ রাজ্ঞী হার্ম্মিওনির শুভানুধ্যায়িনী সমবেদনাময়ী পলিনাও এই শ্রেণীভুক্ত। ভবভূতির সীতার সখী বাসন্তী তথা মাইকেলের সীতার সখী সরমা, ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিকে' কামিনীর শুভানুধ্যায়িনী 'মুড়কিমুখী ময়রাদিদি' (যদিও সামাজিক পদবীতে ন্যূন), 'লীলাবতী'তে লীলাবতীর সখী সারদাসুন্দরী ও রাজলক্ষ্মী, ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা'য় সরলার সখী অমলা কমলা বিমলা, 'সংসারে' বিন্দু ও কালীতারা, ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি'তে নায়িকা ফুলকুমারীর আবাল্যসখী কালী এই শ্রেণীর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে কুন্দর বাল্যসখী চাঁপা, লুৎফউন্নিসার বাল্যসখী মিহরুন্নিসা, হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী, উচ্চঅঙ্গে শ্রীর শুভানুধ্যায়িনী জয়ন্তী—এই শ্রেণীভুক্ত। ধনিকন্যা মৃণালিনী বোধ হয় এই ভাবেই মথুরার রাজকন্যার সখী ছিলেন। ('মৃণালিনী' ৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।) সুন্দরী যদি চন্দ্রশেখরের জ্ঞাতিকন্যা না হইতেন অর্থাৎ নিঃসম্পর্কীয়া

হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও এই শ্রেণীতে ফেলা যাইত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বড় দিদি'তে মাধবী দেবীর সখী মনোরমা ও 'দেবদাসে' পার্ব্বতীর সখী মনোরমা, শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি'তে বাণীর সখী তুলসীমঞ্জরী এই শ্রেণীতে পড়েন।

কোন কোন স্থলে এই শ্রেণীর সখী প্রতিবেশিনী নহেন, নায়িকার সহিত এক গৃহবাসিনী। কিন্তু সে কেবল ঘটনাচক্রে; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা এক পরিবারের নহেন। কালিদাসের শকুন্তলার যুগলসখী, বিমলার সখী আসমানি, ও 'দেবীচৌধুরাণী'র নিশি ও দিবা এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। 'ইন্দিরা'য় অমলা-নির্ম্মলা বালিকাদ্বয়, ইন্দিরার সখী সুভাষিণী, তথা মৃণালিনীর সখী মণি-মালিনী ও পরে রত্নময়ী, এই শ্রেণীর সুন্দর দৃষ্টান্ত। বসন্তকুমারী কিছুদিন নায়িকা রাধারাণীর সহিত এক গৃহবাসিনী, পরে ভিন্ন গ্রামবাসিনী।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর সখী প্রাচী-প্রতীচী উভয়ত্রই অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর সখীরা বৃত্তিভোগিনী ও নায়িকার অধীন, কিন্তু তাঁহারা ভদ্রবংশজা, সাধারণ দাসীশ্রেণীর অর্থাৎ 'দাসী নীচকুলোদ্ভবা' নহেন (১৫)।

(১৫) এই ব্যবস্থার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি 'বিষবৃক্ষে' আছে। 'নগেন্দ্র ও তাঁহার পিতা একটু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকগণকে দাসী নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন।' (১৫শ পরিচ্ছেদ।) হীরা, সূর্য্যমুখী বা কুন্দনন্দিনীর এই শ্রেণীর সখী হইতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থকার অন্যরূপ বিধান করিয়াছেন।

তাঁহারা রাজমহিষী বা রাজকন্যার সহিত অনেকটা সমানভাবে মিশেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের রাজ্ঞীদিগের maids of honour, ladies-in-waiting বাস্তব-জগতে ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কাব্য-নাটকে ইহার অজস্র উদাহরণ মিলে। ক্লিওপেট্রার যুগলসখী চার্ম্মিয়ান-আইরাস,—এই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত; তাহারা পরলোকেও রাজ্ঞীর পার্শ্বচারিণী হইবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মঘাতিনী হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রায় প্রত্যেক নাটকে প্রত্যেক কাব্যেই এই শ্রেণীর সখী আছে। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে প্রমীলার সখী নৃমুণ্ডমালিনী, ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'কমলে কামিনী'তে রাজকন্যা রণকল্যাণীর সখী সুরবালা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে' রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর সখী নির্ম্মলকুমারী এই শ্রেণীভুক্তা। (ভারতচন্দ্রের কাব্যে বীরসিংহ রায়ের কন্যার সখীগণেরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।) বিমলা যদি তিলোত্তমার বিমাতা না হইতেন, তাহা হইলে তিনিও এই শ্রেণীতে পড়িতেন। এই হিসাবেই বিমলা পূর্ব্বজীবনে মানসিংহ-মহিষী উর্ম্মিলাদেবীর সখী ছিলেন। লুৎফউন্নিসা প্রকাশ্যে এই-ভাবেই খস্রুজননীর সখী ছিলেন। পোর্শিয়ার সখী নেরিসা (১৬) ও জুলিয়ার সখী লুসেটা এই শ্রেণীর। (পোর্শিয়া-জুলিয়া রাজকন্যা না হইলেও ধনিকন্যা অভিজাতবংশীয়া।) বৃত্তিভোগিনী হইলেও এই শ্রেণীর সখীর সখ্য অকৃত্রিম, তাহাদের মুখের

(১৬) Mrs. Jameson নেরিসাকে Confidential woman-in-waiting or female companion বলিয়াছেন।

ভালবাসা নহে। তাহাদিগের স্নেহ সহোদরা ভগিনীর স্থায়। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা যে ঊর্ম্মিলাদেবী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তিনি আমাকে সহচারিণী দাসী বলিয়া জানিতেন না; আমাকে প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর স্থায় জানিতেন,—" ইহা এই শ্রেণীর সকল সখী-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

(৩) তৃতীয় শ্রেণী আপাতদৃষ্টিতে সখীসম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে কি না সন্দেহ, তাহারা রীতিমত দাসী, চাকরানী বা বাঁদী। কিন্তু তাহারা শুধু যে প্রয়োজন পড়িলে দূতীর কাজ করিতেছে এমন নহে, তাহারা অনেক সময় নায়িকার সুখদুঃখভাগিনী, সুখের সময় আনন্দোচ্ছ্বসিতা ও কৌতুকময়ী, দুঃখে সমবেদনাময়ী, সান্ত্বনা-দায়িনী, মন্ত্রণাদায়িনী, সাহায্যকারিণী। সুতরাং এই শ্রেণীকে সখীসম্প্রদায় হইতে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। সংস্কৃত সাহিত্যে কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে লহনার দুর্ব্বলা দাসী ও ভারতচন্দ্রের ভবানন্দ মজুমদারের দুই পত্নী চন্দ্রমুখী-পদ্মমুখীর সাধী মাধী দাসী এই শ্রেণীর। ৺রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটকে' সাবিত্রীর দাসী সাবি ও ৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকে মহামায়ার দাসী কাজলা ও সরলার দাসী চাঁপা, প্রাচীন সাহিত্যের উল্লিখিত উদাহরণগুলিরই জের। রবীন্দ্র-নাথের 'মানভঞ্জন' গল্পে গোপীনাথ শীলের অবহেলিতা পত্নী গিরিবালার 'সুরসিকা দাসী সুধো অর্থাৎ সুধামুখী'ও এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য। 'মৃণালিনী'তে গিরিজায়া এই শ্রেণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'কপালকুণ্ডলা'য় পেষমন, 'চন্দ্রশেখরে' কুলসম, 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'

অমলা, 'ইন্দিরা'য় হারাণী, 'রাধারাণী'তে চিত্রা, 'সীতারামে' পাঁচ-কড়ির মা ও মুরলা, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ক্ষীরি চাকরানী, 'রাজ-সিংহে' যোধপুরীর দেবী চাকরানী--ইহাদিগকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

এই তৃতীয় শ্রেণীর প্রসঙ্গে হয় ত পাঠকবর্গের ধারণা হইতেছে যে, দাসীমাত্রেই সখী, প্রবন্ধলেখক ইহাই বলিতে চাহেন। বস্তুতঃ কিন্তু যেখানেই নায়িকার পার্শ্বে দাসী বা বাঁদী দেখিয়াছি, সেখানেই তাহাকে ধরিয়া সখীর রেজিমেণ্ট-ভুক্ত করিয়াছি,—তাহা নহে। আয়েষার পরিচারিকা ও কৎলুখাঁর অন্তঃপুরের দাসী, 'বিষবৃক্ষে' কৌশল্যা-নাম্নী পরিচারিকা, 'চন্দ্রশেখরে' চন্দ্রশেখরের বাটীর দাসী, তথা শৈবলিনীর সমভিব্যাহারিণী পুরন্দরপুরের দাসী পার্ব্বতী, তকী খাঁর অন্তঃপুরে দলনীর নূতন বাঁদী করিমন, 'রজনী'তে তিনকড়ি, বা রজনীর বা লবঙ্গলতার সঙ্গের পরিচারিকা, 'দেবীচৌধুরাণী'তে ফুলমণি নাপিতানী ও গোবরার মা (!) এবং 'সীতারামে' মুরলার পদচ্যুতির পর রমার দাসী যমুনা—ইহাদিগকে ত তৃতীয়শ্রেণীতে ফেলি নাই। যে কয়জনকে আপাততঃ এই শ্রেণীতে ফেলিয়াছি, সখীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবার পক্ষে ইহাদিগের কি দাবী আছে, যথাস্থানে ভাল করিয়া তাহার বিচার করিব। বিচারে যদি দেখি সে দাবী দুর্ব্বল, তাহা হইলে তাহাদিগকে এই ফর্দ্দ হইতে খারিজ করিতেও আপত্তি করিব না।

তৃতীয় শ্রেণী।

সখী-সম্প্রদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছি। এক্ষণে তিন শ্রেণীর আলোচনা-কালে উচ্চ হইতে ক্রমিক-ভাবে নিম্ন ও নিম্নতর শ্রেণীতে না নামিয়া নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিব, কেন-না ইহাই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। এই জন্য প্রথমে তৃতীয় শ্রেণী ধরিব।

(১) 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ক্ষীরি

'বিষবৃক্ষে'র হীরা-সম্বন্ধে পূর্ব্বে (২১-২২ পৃঃ) বুঝাইয়াছি যে, কুন্দর প্রতি তাহার আদর-যত্ন কপটতা মাত্র, সে প্রকৃতপক্ষে কুন্দর দুঃখ দেখিয়া, সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, সুখী হইত; সুতরাং তাহাকে এ শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের খাস ঝী 'ক্ষীরোদা—ওরফে ক্ষীরোদমণি—ওরফে ক্ষীরাব্ধিতনয়া—ওরফে শুধু ক্ষীরি' একেবারে পরিত্যাজ্যা নহে। (তাহার 'মোটাসোটা গাটাগোটা মল পায়ে গোট-পরা—হাসি-চাহনিতে ভরা-ভরা' চেহারায় ভারতচন্দ্রের তথা বঙ্কিমচন্দ্রের হীরার কথা এক একবার মনে পড়ে।)

যদিও ভ্রমর নিজের হৃদয়বেদনা ক্ষীরিকে জানান নাই, এবং তাহাকে বুঝিতে দেন নাই যে, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ের এক কোণে অনুভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে (১ম খণ্ড ২১শ পরিচ্ছেদ), তথাপি বলিতে হয় যে, ক্ষীরি ভ্রমরের

কতকটা 'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী'; আর 'পার্শ্বচারিণী' ত বটেই। তাই ভ্রমর গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আসক্তির কথা গোবিন্দ-লালের মুখে শুনিয়া, ক্ষীরিকে রোহিণীর কাছে দূতী করিয়া পাঠাইলেন; এবং তাহাকে 'বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলায়—কলসী গলায় দিয়ে' ডুবিয়া মরিতে বলিয়া দিলেন (এ যেন শ্রীরাধার চন্দ্রাবলীর নিকট দূতী পাঠান!)। ক্ষীরি সানন্দে সে আদেশ পালন করিল (১ম খণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদ)। তাহার পর গোবিন্দলাল 'দেহাতে' গেলে, ক্ষীরোদা ভ্রমরের 'প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা' অবস্থার বাড়াবাড়ি সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার ব্যথায় প্রলেপ দিবার ভ্রান্ত প্রয়াসে, তিনি যে 'খণ্ডিতা' তাঁহাকে সেই কথা বুঝাইল; অর্থাৎ রোহিণী-ঘটিত ব্যাপার একটু রঙ্গ চড়াইয়া বলিল। ফলে হিতে বিপরীত হইল; ক্ষীরি পতিপক্ষ-পাতিনী ভ্রমরের হস্তে 'উত্তম-মধ্যম ভোজন' করিল। (১ম খণ্ড ২০শ পরিচ্ছেদ)। কিন্তু ইহা ভালবাসার মা'র, বঙ্কিমচন্দ্র সেটুকু বুঝাইতে ছাড়েন নাই। 'ভ্রমর ক্ষীরোদাকে ভালবাসিত, সেই জন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল' (১ম খণ্ড ২২শ পরি-চ্ছেদ)। আবার ক্ষীরি মা'র খাইয়া অভিমানে গোবিন্দলালের কলঙ্ক-কথা হরিদ্রাগ্রাম-ময় রাষ্ট্র করিল বটে, কিন্তু তথাপি সে ভ্রমরকে ভালবাসিত। 'ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ-দ্বেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না; তবে ভ্রমর, যে তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, সেটা অসহ্য'। (১ম খণ্ড ২১ পরিচ্ছেদ)।

যাহা হউক, গোবিন্দলালের সচ্চরিত্রে সন্দেহ করিয়া ভ্রমর যখন, গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিয়া, পিত্রালয়ে যাওয়া স্থির করিলেন, তখন তিনি আবার সেই ক্ষীরিরই শরণ লইলেন, মাতাকে 'পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল' (১ম খণ্ড ২৪শ পরিচ্ছেদ)। এক্ষেত্রেও ক্ষীরি বিশ্বাস-বিশ্রাম-কারিণী, সাহায্য-কারিণী, পত্রহারীরও কাছাকাছি (তবে আদিরসের ব্যাপারের মত প্রেমপত্রী নহে)।

ইহা হইতে বুঝা গেল, ক্ষীরির দাবী একেবারে দুর্ব্বল নহে। তবে এই (realistic picture) বাস্তবচিত্রে চমৎকারিত্ব অর্থাৎ রোম্যাণ্টিক ভাব কিছুমাত্র নাই বলিয়া, পাঠকবর্গ তাহার নাম এই ফর্দ্দ হইতে খারিজ করিতে চাহিলে, তাহাতে আমার প্রবল আপত্তি নাই।

(২) 'রাজসিংহে' দেবী চাকরানী

'পুনঃ-প্রণীত' 'রাজসিংহে' যোধপুরী বেগমের প্রসঙ্গে আছে—'দেবী নামে তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিল। সে বড় বিশ্বাসী।' তাহাকে বখশিশ আর চিরকালের জন্য মুক্তির লাভ দেখাইয়া যোধপুরী তাহা দ্বারা রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চল-কুমারীকে দিল্লী আসিতে বারণ করিয়া ও রাণা রাজসিংহের শরণ লইতে বলিয়া পাঠাইলেন (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। দেবীও মতিওয়ালী সাজিয়া কৌশলে রূপনগরের রাজান্তঃপুরে প্রবেশ

করিয়া যোধপুরীর শিক্ষামত সকল কথা তাঁহাকে বলিল (৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ)। এক্ষেত্রেও (ক্ষীরির ন্যায়) দেবী 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী' বটে, দৌত্য-কার্য্যও করিয়াছে; তবে প্রেমের সহায়তার জন্য নহে। সখীর বা দূতীর অন্যান্য লক্ষণও মিলে না। অতএব ইহাকে খারিজ করিলে আমার কোন আপত্তি নাই।

(৩) 'সীতারামে' পাঁচকড়ির মা

'সীতারামে' শ্রীর প্রসঙ্গে আছে—'পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল; সে শ্রীর মার অনেক কাজ-কর্ম্ম করিয়া দিত' (১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ)। ['দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লর প্রসঙ্গে ফুলমণি নাপিতানী ও 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিরণ্ময়ীর প্রসঙ্গে অমলা স্মর্ত্তব্য।]

শ্রী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ভ্রাতা গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য স্বামী সীতারামের নিকট যাইতে উদ্‌যোগী হইয়া এই পাঁচকড়ির মাকে সঙ্গে লইল। পাঁচকড়ির মা পাঁড়েঠাকুর—শ্রীবিষ্ণু :—মিশর ঠাকুরের সাহায্যে জীবন ভাণ্ডারীর নাগাল পাইয়া তাহাকে তোয়াজ করিয়া তাহার মারফত শ্রীকে সীতারামের সমীপে পৌছা-ইয়া দিল। পাঁচকড়ির মা স্বামিসম্ভাষণে সহায়তা করিয়া সখীর কায করিয়াছে, তবে এ বাসকসজ্জা অভিসার প্রভৃতি আদিরসের ব্যাপার নহে, 'ভারি বিপদে' পড়িয়া শ্রী সীতারামের শরণ লইয়াছিল। অতএব এ ক্ষেত্রেও বোধ হয় দাবী দুর্ব্বল।

পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে এ নামটিও ফর্দ হইতে বাদ দিতে পারেন।

(৪) 'সীতারামে' মুরলা

'সীতারামে' মুরলা 'রাজবাটীর পরিচারিকা,' ছোটরাণী রমার খাস ঝী। সে শুধু চতুরা, প্রগল্‌ভা, সাহসিকা নহে, রাজান্তঃপুরের খিড়কির প্রহরী পাঁড়ে ঠাকুরের সহিত তাহার কথাবার্ত্তা (২য় খণ্ড ৪র্থ ও ৭ম পরিচ্ছেদ), গঙ্গারামের প্রতি তাহার বিদ্রূপ ('আবার আসিবে বোধ হইতেছে' ২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), দরওয়ানকে দিয়া গঙ্গারামের নিকট হইতে তাহার টাকা আদায় করিবার চেষ্টা (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ), এবং গ্রন্থকার তাহার মনোভাব সম্বন্ধে যে একটু-আধটু ইঙ্গিত করিয়াছেন—এই সমস্ত হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সে দুশ্চরিত্রা, 'বিষবৃক্ষে'র মালতী গোয়ালিনী, 'দেবী চৌধুরাণী'র ফুলমণি নাপিতানী, ও ভারতচন্দ্রের মালিনীর শ্রেণীর লোক। 'ইন্দিরা'র হারাণীর চরিত্রে যে দৃঢ় নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, মুরলার চরিত্রে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। এই শ্রেণীর লোকই গুপ্ত-প্রণয়ের 'দূতী' হয়; তবে তাহাকে যে দূতীর কার্য্য করিতে হয় নাই, সে তাহার গুণে নহে, রমার গুণে। 'রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র' (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ), তাহার উদ্দেশ্য গুপ্ত-প্রণয় নহে। রমা দায়ে পড়িয়া সন্তানের রক্ষার জন্য স্ত্রী-বুদ্ধিতে গঙ্গারামকে ডাকাইয়াছিল; পরে মুরলার একদিনকার কথায় এ কার্য্য অন্যে কি চক্ষে দেখিতে

পারে, রমা তাহা বুঝিল। গঙ্গারাম তাহার দ্বারা দূতীর কায করাইতেই ইচ্ছুক ছিল। শেষে তাহার অদর্শনে 'নিজে এক দূতী খাড়া করিয়া মুরলার কাছে পাঠাইলেন—তাকে ডাকিতে।' (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ)। মুরলা এই ব্যাপারকে গুপ্ত-প্রণয় বলিয়া বুঝিতেই প্রস্তুত ছিল। 'যে অপবিত্র, সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিয়া কাজ করে।' যাহা হউক, তাহার ও পাঁড়ে ঠাকুরের দোষে রমার কলঙ্ক রটিল (৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ)। রমার বিচারকালে সে নন্দার উপদেশে সত্যের মর্য্যাদা রাখিয়া নিজ দোষের কতকটা ক্ষালন করিয়াছিল। (৩য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ)। তাহার পর, ভারতচন্দ্রের মালিনীর মত, যখন 'কালামুখীকে' 'মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, নগরের বাহির করিয়া' দেওয়া হইল, তখন তাহার উপযুক্ত শাস্তিই হইল (৩য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

ফল কথা, মুরলা রমার 'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী' বটে; আবার 'দৌত্যব্যাপারপারঙ্গমা'ও বটে; সে গুপ্ত-প্রণয়ের সহায়তা করিতেছে মনে করিয়াই উৎসাহের সহিত এই কার্য্য করিয়াছিল (যদিও রমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল)। এ অবস্থায় মুরলাকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

পরে 'মুরলার বদলে, যমুনা-নাম্নী একজন পরিচারিকা রাণীর প্রধানা দাসী হইয়াছিল।' (৩য় খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ)। তাহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার যেটুকু ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা

যায়, সে প্রাচীনা হইলেও, তাহার চরিত্র মুরলারই এপিঠ ওপিঠ। সে যদিও 'রমাকে বিলক্ষণ যত্ন করিত,' তথাপি রমা তাহার সঙ্গে ঔষধ-বেচার যে বন্দোবস্ত করিল, তাহাতে বুঝা যায়, তাহার ভালবাসা নিঃস্বার্থ নহে। সুতরাং তাহাকে এ শ্রেণীতে ধরিবার কোনও কারণ নাই।

(৫) 'রাধারাণী'তে চিত্রা

রাধারাণীর দাসী চিত্রা-সম্বন্ধে পূর্ব্বে (২৩ পৃঃ) যাহা বলিয়াছি, তাহার অধিক বিশেষ কিছু বলিবার নাই। রাধারাণী ও রুক্মিণীকুমার যে মুহূর্ত্তে মালা-বদল করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে 'পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল। রাধারাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শাঁক বাজাইল কে?" তাঁহার একজন দাসী, চিত্রা, উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমি!" রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাজাইলি?" চিত্রা বলিল, "কিছু পাইব বলিয়া।" বলা বাহুল্য যে চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা মিথ্যা। রাধারাণী তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিল।' (৮ম পরিচ্ছেদ)। ইহার পূর্ব্বে বা পরে চিত্রার আর কোন প্রসঙ্গ নাই। এটুকু কায সে রাধারাণীর শিক্ষামত করিল, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নহে। তথাপি ইহাতে একটু মাধুর্য্য, একটু চমৎকারিত্ব আছে, অতএব চিত্রাকেও এই শ্রেণীতে ফেলিতে দোষ কি? (চিত্রা নামটি শ্রীরাধার অষ্টসখীর অন্যতমার নাম হইতে গৃহীত, এ কথাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা ভাল)।

(৬) 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' অমলা

'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিরণ্ময়ীর বাল্যকাল হইতে পুরন্দরের সহিত সাহচর্য্যে অন্যোন্যানুরাগ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহার বাল্যসখী নাই। পুরন্দর চলিয়া গেলেও কোনও বাল্যসখীর নিকট তাহার মনোবেদনা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা নাই; পত্রার্দ্ধ পাঠ করিয়া কোনও বিশ্বাসপাত্রীর সহিত তাহার এ বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা নাই; মা-বাপ মরিলেও কুন্দর মত তাহার ব্যথা জুড়াইবার স্থান নাই।

যাহা হউক, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী সিংহল হইতে ফিরিবার সম-সমকালে অমলার অবতারণা করা হইয়াছে। রাত্রে যুবতী হিরণ্ময়ীর একা থাকা উচিত নহে বলিয়া, হিরণ্ময়ী রাত্রিতে 'অমলার গৃহে শয়ন করিতেন।' ('দেবী চৌধুরাণী'তে একটু প্রভেদ, ফুলমণি প্রফুল্লর বাড়ীতে রাত্রিতে শয়ন করিত।) 'অমলা নামে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল।— সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল।' (৫ম পরিচ্ছেদ।) সে মুরলা-যমুনা-মালতী-ফুলমণির মত দুশ্চরিত্রা নহে, হারাণী ও পাঁচকড়ির মার সহিত তুলনীয়া। অমলা পুরন্দরের প্রত্যাগমনের সংবাদ হিরণ্ময়ীকে দিল; হিরণ্ময়ী শুধু 'চিনি' বলিয়া সায় দিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রেষ্ঠিসুতের কি বিবাহ হইয়াছে'; কিন্তু নিজের মনের কথা তাহাকে বলিলেন না। অমলা যখন পুরন্দরের প্রেরিত উপহার বলিয়া মহামূল্য হীরার হার তাঁহাকে দিল, তখনও হিরণ্ময়ী, পুরন্দর তাঁহার হৃদয়ের

কতখানি জুড়িয়া আছে, তাহা অমলাকে বলিলেন না। হিরণ্ময়ীর বাসের জন্য পুরন্দর-কর্তৃক ক্রীত গৃহে যখন হিরণ্ময়ী অমলার সহিত বাস করিতে লাগিলেন, তখন তিনি অমলাকে পুরন্দরের গৃহে যাইতে নিষেধ করিলেন, কারণ জানাইলেন না। আবার অমলা বলিল, "রাজবাড়ী আমার কার্য্য হইয়াছে।—আমি সংসার চালাইব।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) উভয় পক্ষেই লুকোচুরি চলিল। তাহা হইলে বুঝা গেল, অমলা হিরণ্ময়ীর 'পার্শ্বচারিণী" হইলেও "বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী" নহে।

যাহা হউক, রাজবাড়ী হইতে হিরণ্ময়ীর জন্য শিবিকা আসিলে সে-ই তাঁহাকে সংবাদ দিল, হিরণ্ময়ী সখী বা দাসী হিসাবে তাহাকে সঙ্গেও লইলেন (৭ম পরিচ্ছেদ), এই জন্যও বটে এবং অমলা তাঁহাকে যত্ন-আর্ত্তি করিত, ভালবাসিত বলিয়াও বটে, তাহাকে এই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছি। রাজা মদনদেব যে তাহাকে হিরণ্ময়ীর 'দাসী' বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া 'দূতী'ও বলিয়াছেন, সেটা অবশ্য তাঁহার ধাপ্পা দেওয়া কথা। (৯ম পরিচ্ছেদ)। বরং শেষ পরিচ্ছেদে যে রহস্যোদ্ভেদ হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়, রাজাই অমলা দ্বারা (হিরণ্ময়ীকে হার পাঠাইয়া) কতকটা দূতীর কার্য্য করাইয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু সে অবশ্য সদুদ্দেশ্যে।

(৭) 'ইন্দিরা'য় হারাণী

'ইন্দিরা'য় হারাণী একটিবার ইন্দিরার প্রণয়ব্যাপারে পত্রহারী দূতীর কার্য্য করিয়াছে ও 'অভিসার'-কালে নায়িকার অনুরোধে

তাহাকে নায়কের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছে। ছোট 'ইন্দিরা'র ব্যাপারটা তেমন নির্দ্দোষ নহে। মনে রাখিতে হইবে, ছোট 'ইন্দিরা'র ইন্দিরার সুভাষিণী সখী নাই, সুতরাং ইন্দিরাকে মামলা তদ্‌বিরের সব ভারই নিজে লইতে হইয়াছে, কেবল 'রামরাম দত্তের পরিচারিকা' হারাণী একটু দূতীর কায করিয়াছে। 'ইন্দিরা বলিল, "ঝি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।" 'হারাণী মৃদু হাসিল,' 'একটু গুরু মহাশয়গিরি' করিল, একবার 'ছি' বলিল, কিন্তু শেষে-রাজি হইল। "তোমার জন্য এ কাজ আমি করিব, কিন্তু আর কারও জন্য হইলে করিতাম না।" 'হারাণীর নীতি-শিক্ষা এইরূপ।' (৪র্থ পরিচ্ছেদ।) সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলে ইন্দিরা আবার তাঁহার কাছে *হারাণীকে পাঠাইল,* 'হারাণী আবার হাসিয়া বলিল, "ছি," কিন্তু দৌত্যে স্বীকৃত হইয়া গেল।' (৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

কিন্তু গৃহস্থবাড়ী এরূপ দূতীগিরিতে রাজি ঝী থাকা বড় দোষের বিষয়, ইহা বুঝিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা'য় হারাণীর চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়াছেন। বড় 'ইন্দিরা'য় সে সুভাষিণীর 'খাস ঝি', সুভাষিণী প্রয়োজন হইলেই তাহাকে দিয়া রমণবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। গৃহস্থঘরে দূতীগিরি এই পর্য্যন্তই চলে। (৭ম পরিচ্ছেদ)। ছোট 'ইন্দিরা'য় হারাণী সামান্য আপত্তির পরই বাবুটির সংবাদ আনিতে, দূতীগিরিতে, রাজি হইয়াছিল; বড় 'ইন্দিরা'য় যদিও

সে ভারতচন্দ্রের মালিনীর মত, 'চাল্লিশ পার, হাসি মুখে ধরে না, সকল তাতেই হাসি, একটু তিরবিরে,' কিন্তু ইন্দিরা সংবাদ আনিবার কথা তাহাকে বলিবামাত্র 'হারাণী একেবারে হাসি বন্ধ করিল। এত হাসি, যেন ধূঁয়ার অন্ধকারে আগুন ঢাকা পড়িল।' (পক্ষান্তরে, সে ছোট 'ইন্দিরা'র প্রস্তাব শুনিয়া মৃদু হাসিয়াছিল)। সে ইন্দিরাকে মৃদু ভৎ'সনা করিল, 'কেলেঙ্কারী' হইবে বলিয়া ইন্দিরার মুখ চাহিয়া টাকা কয়টা ছুড়িয়া ফেলিল না, কিন্তু কথাটা একেবারেই ঝাড়িয়া ফেলিল, দৃঢ়স্বরে বলিল, "কিছুতেই আমা হতে এ কাজ হইবে না।" শেষে ইন্দিরার নির্ব্বন্ধাতিশয় ও তাহার কান্না দেখিয়া, 'বৌ-ঠাকুরাণী যদি হুকুম দেন' তবে কাযটি করিতে স্বীকৃতা হইল, কিন্তু ঘুঁষের টাকা কিছুতেই লইল না। (১২শ পরিচ্ছেদ)। তাহার পর সে যখন 'বৌ-ঠাকুরাণী ঝাঁটা মেরেছে, বারণ ত করেনি' বলিয়া যাইতে রাজি হইল ও পত্রহারী দূতী সাজিল, তখন সে কতকটা বুঝিয়াছে 'কিছু দোষ নাই'; 'উনি আর জন্মে আমার স্বামী ছিলেন' ইন্দিরার এই কথার উত্তরে বলিয়াছে, 'আর জন্মে, কি এ জন্মে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না'; তাই সে হাসিয়া বলিল, "যদি এ জন্মের হন, তবে আমি পাঁচশত টাকা বখশিশ নিব; নহিলে আমার ঝাঁটার ঘা ভাল হইবে না।" (১৩শ পরিচ্ছেদ)। (১৭) তাহার পর অভিসার-

(১৭) আখ্যায়িকার শেষ অংশে গ্রন্থকার হারাণীর দোষক্ষালনের জন্য আবার সুভাষিণীর মারফত আমাদের গোচর করিয়াছেন।—"হারাণী

লীলা। 'হারাণী হাসিতে হাসিতে গেল। পরে আলো সব নিবিলে, সবাই শুইলে, হারাণী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘর দেখাইয়া দিয়া আসিল।' (১৪শ পরিচ্ছেদ)।

হারাণী 'বিশ্বাসী', ইন্দিরার কান্না দেখিয়া তাহার 'দয়া হইল'; অতএব সে 'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী' ও 'সমদুঃখসুখা' উভয়ই কতকটা বটে; তবে সকল কথা শুনিলে সে বিশ্বাস করিবে না বলিয়া ইন্দিরা তাহাকে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না। (১২শ পরিচ্ছেদ)। ফলতঃ হারাণীর এই শ্রেণীভুক্ত হইবার বিলক্ষণ দাবী আছে। তবে এই আখ্যায়িকায় ইন্দিরার আসল সখী সুভাষিণী। সে আলোচনা যথাস্থানে করিব।

(৮) 'কপালকুণ্ডলা'য় পেষ্‌মন

পেষ্‌মন 'কপালকুণ্ডলা'য় মতিবিবি ওরফে লুৎফউন্নিসার দাসী বা বাঁদী। ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে আমরা মতিবিবির প্রথম দেখা পাই, এবং উক্ত খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে আমরা তাঁহার দাসী পেষ্‌মনের প্রথম দেখা পাই। মতিবিবি (পূর্ব্বনাম পদ্মাবতী) বহুকাল পরে স্বামীকে দেখিলেন, চিনিলেন; আবার স্বামীর নবপরিণীতা অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখিলেন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয় উদ্‌বেল

প্রথমে কিছুতেই টাকা লইবে না। বলে, আমার লোভ বাড়িয়া যাইবে। এটা যেন ভাল কাজই করিয়াছিলাম, কিন্তু এ রকম কাজ ত মন্দই হয়। আমি যদি লোভে পড়িয়া মন্দেই রাজি হই।" (উপসংহার, ২২শ পরিচ্ছেদ)। হীরা, মালতী গোয়ালিনী, ফুলমণি নাপিতানী, মুরলা প্রভৃতির সহিত তাহার চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রভেদ লক্ষণীয়।

হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং একজন সখীর প্রয়োজন, তাহার নিকট মুখ ফুটিয়া দুই এক কথা বলিলেও হৃদয়ের ভার লঘু হয়। তাই ঠিক এই সময়ে পেষ্‌মনের অবতারণা। মতিবিবি দাসী-সঙ্গে নবকুমারের নব-পরিণীতাকে দেখিয়া আসিলেন, আপনার গা হইতে খুলিয়া সমস্ত গহনা দিয়া তাহাকে সাজাইলেন। বিরলে আসিলে পেষ্‌মন মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবিজান! এ ব্যক্তি কে?" যবনবালা উত্তর করিলেন, "মেরা শৌহর।" (২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।) পেষ্‌মন 'যবনবালা'র পূর্ব্ব ইতিহাস জানিত না, সুতরাং কথাটা বুঝিতে পারিল না, মতিবিবিও ইহার অধিক তখন ভাঙ্গিলেন না। যেটুকু বলিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভার একটু লঘু হইল, ইহাই তখনকার মত যথেষ্ট। মতিবিবির মত আত্মনির্ভরক্ষমার তিলোত্তমা-মৃণালিনীর মত সখীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। আমরাও এইটুকু হইতে মতি-বিবির পূর্ব্বজীবন-সম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত পাইলাম। তবে ইহাতে কেবল কৌতূহলের উদ্রেক হইল। (পরবর্ত্তী ৩য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদের সহিত ১ম খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদ মিলাইয়া পড়িলে তবে আমরা মতিবিবির পূর্ণপরিচয় পাইব।)

ইহার পরে আবার ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে আমরা মতিবিবি ও পেষ্‌মনকে নবকুমার-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখি। (১৮)

---

(১৮) যাঁহারা ২য় খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে পেষ্‌মনকে শিবিকারোহণে আসিতে দেখিয়া তাহাকে নির্ম্মলকুমারীর মত দ্বিতীয় শ্রেণীর সখী বলিয়া মনে করিয়া বসিবেন, তাঁহারা ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে মতিবিবির পরিত্যক্ত

"পেষ্‌মন, আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?" ইত্যাদি আলোচনায় মতিবিবির মনোভাব-সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর জ্ঞান লাভ করা যায়। এরূপ কথাবার্ত্তায় তাঁহার মনের ভারও একটু লঘু হইল। তাহার পর রাজনীতিসম্বন্ধে উভয়ের যে আলোচনা হইল, তাহা হইতে বুঝা গেল, পেষ্‌মন মতিবিবির বিশ্বাসপাত্রী বটে। তিনি যে মেহেরউন্নিসার মন জানিতে বর্দ্ধমানে যাইতেছেন, সে কথাও পেষ্‌মনকে তিনি অসঙ্কোচে বলিলেন। তবে রাজনীতির ব্যাপারে বিফলমনোরথ হওয়াতে তাঁহার মনে যে 'নূতন ভাবে'র উদয় হইল, মতি আপাততঃ 'তাহা পেষ্‌মনকে বলিলেন না।...পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে।' ইহা একটা কাব্যকৌশল, অপিচ মতিবিবির চরিত্রের ক্রমিক বিকাশপ্রদর্শনের জন্যও প্রয়োজনীয়।

৩য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে আবার যখন উভয়ের দেখা পাই, তখন সেই কথাটা প্রকাশ পাইল। ইহার মধ্যে মতিবিবির রাজনীতিক্ষেত্রে নৈরাশ্য ত ঘটিয়াছিলই, তাঁহার মনোরাজ্যেও একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। 'পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।' তিনি আগ্রা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাদেশে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তবে 'সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না।' 'অনেকদিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল?' ইত্যাদি জ্বালাময়

অলঙ্কারের প্রতি পেষ্‌মনের লোভের কথা এবং ৩য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে মতিবিবির পরিত্যক্ত পোষাক-লাভের কথা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন, সে দাসী অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর নহে।

বাক্যগুলি তিনি মনের আবেগে পেষ্‌মনকে বলিয়া হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিলেন। পেষ্‌মনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও তাঁহার তীব্র অনুতাপ ও 'নূতন ভাবে'র পরিচয় পাইলেন।

ইহার পর, আর একবারমাত্র আমরা পেষ্‌মনের দেখা পাই। ৩য় খণ্ডের ৭ম পরিচ্ছেদে সপ্তগ্রামের 'উপনগরপ্রান্তে' আমরা উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাই। লুৎফউন্নিসা 'পেষ্‌মনের সাহায্যে' পুরুষবেশ ধারণ করিতেছেন ও নিজের উদ্দেশ্যের কথা অকপটে তাহাকে বলিতেছেন। তবে তিনি পেষ্‌মনকে নেরিসার মত তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন না; (তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুবিধাও হইত না)। বরং পেষ্‌মন তাঁহাকে 'সে নিবিড় বন'-মধ্যে রাত্রিকালে একাকিনী যাইতে নিষেধ করিল। অবশ্য অতিসাহসিকা লুৎফউন্নিসা সে নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না, তাহার 'কথার কোন উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।' তিনি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরক্ষমা। যাহা হউক, পেষ্‌মন পূর্ব্ববর্ণিত কয়েকটি স্থলে যে সখীর স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কাব্য-কৌশলের কথা না তুলিলে পেষ্‌মনের অবতারণার উদ্দেশ্য-বিচার অসম্পূর্ণ থাকিবে। কাব্যে তিন প্রকারে পাত্রপাত্রীদিগের মনোভাব পাঠকের গোচর করা যায়। ১ম, লেখকের সরাসরিভাবে বর্ণনায়; কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত (inartistic) কাঁচা। ২য়, পাত্রপাত্রীদিগের কার্য্য ও বাক্য দ্বারা, বিশেষতঃ স্বগতোক্তি দ্বারা; কিন্তু স্বগতোক্তি, অগত্যা,

অর্থাৎ অন্য উপায় না থাকিলে, ব্যবহর্ত্তব্য। তন্ন, পাত্র বা পাত্রীর কোন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা বা পত্র-ব্যবহার দ্বারা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে (এবং অপর অনেক ক্ষেত্রে) সখীর অবতারণার ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মতিবিবির পেষ্‌মনের সহিত কথাবার্ত্তা হইতে আমরা উক্ত প্রতিনায়িকার মনোভাব-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বুঝিতে পারি। অথচ বেশ স্বাভাবিক ভাবে ইহার অবতারণা করা হইয়াছে।

(৯) 'চন্দ্রশেখরে' কুল্‌সম্‌

'চন্দ্রশেখরে' কুল্‌সম্‌ দলনী বেগমের দাসী বা বাঁদী। সে আস্‌মানি-পেষ্‌মনের উন্নত সংস্করণ, অধিকতর পূর্ণতা ও নিপুণতার সহিত চিত্রিত, আখ্যায়িকা-কারের কলাকৌশলের ক্রমোন্নতির পরিচায়ক।

আমরা ১ম খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে দলনীর প্রথম দেখা পাই (এই খণ্ডে আর দলনীর প্রসঙ্গ নাই), তাহার পর ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে কুল্‌সম্‌কে দলনীর পার্শ্বে প্রথম দেখি। কুল্‌সম্‌ দলনীকে রাজনীতির সংবাদ দিতেছে; পূর্ব্বে নবাবের সহিত রাজনীতি-সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল দলনী তাহার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, এক্ষণে কুল্‌সমের মুখে সংবাদ শুনিয়া দুশ্চিন্তা আরও বাড়িল; তিনি পূর্ব্ব হইতেই এ সম্বন্ধে গুর্‌গন্‌ খাঁকে পত্র পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এক্ষণে আরও দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। এই গোপনীয় ও বিপজ্জনক কার্য্যে তাঁহার একজন 'বিশ্বাসবিশ্রাম-

কারিণী' 'নায়িকা-সহায়িনী'র প্রয়োজন, তাই এই সন্ধিক্ষণে কুল্‌সমের অবতারণা। প্রথমে উভয়ে একটু রঙ্গতামাসা হইল (অলঙ্কারশাস্ত্রের 'পরিহাস' বা 'নর্ম্ম'), তাহার পর যখন দলনী গুর্‌গন্ খাঁর কাছে গোপনে পত্র পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন কুল্‌সম্ অসম্মত হইল,—হারাণীর মত নীতিজ্ঞানের জন্য নহে, ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইবার ভয়ে। কিছুক্ষণ পরে সে স্বীকৃতা হইল। কাব্য-নাটকে 'লেখ্য-প্রস্থাপন' নায়িকার কার্য্য, পত্র-হারী দূতী যথাস্থানে লিপি পৌঁছাইয়া দেয়। কুল্‌সম্ গুর্‌গন্-দলনীর ভ্রাতা-ভগিনী-সম্বন্ধ জানিত না (পাঠকও এখন পর্য্যন্ত জানেন না), সুতরাং সে বুঝিল, কাব্যের সাধারণ নিয়মে ইহা মদন-লিপি। সে 'ইতস্ততঃ'র পর দূতীর কার্য্যে সম্মত হইল।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা (গুর্‌গন্ ও দলনীর সম্পর্কের পরিচয় পাই এবং) দলনীকে কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে লইয়া 'রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া' গুর্‌গনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখি। গুর্‌গন্ যখন কূটরাজনীতির প্রয়োজনে দলনীর 'দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে'ন না, তখন দলনী আকুলহৃদয়ে কাঁদিয়া বলিলেন, "কুল্‌সম্!" কুল্‌সম্‌ও সমবেদনাময়ী সখীর ন্যায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল, পরামর্শ দিল, কিন্তু সে পরামর্শ দলনীর ভাল লাগিল না। (এই তাহাদের প্রথম মতভেদ। ইহা prelude অর্থাৎ সূচনা-মাত্র। পরে তাহাদের আরও বিষম মতভেদ হইবে।) যাহা হউক, আপাততঃ তাঁহারা 'দীর্ঘাকার পুরুষের' নিকট অভয় ও আশ্রয় পাইলেন। (২য় খণ্ড ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ)।

তাহার পর, অনেক বিচিত্র ঘটনার পর উভয়েই ইংরেজের হাতে বন্দী হইলেন। (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।) আখ্যায়িকা-কার প্রধান আখ্যান (চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনী-ঘটিত) লইয়া ব্যস্ত থাকায় আবার বহু পরে (৫ম খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদে) আমরা ইহাদিগের সাক্ষাৎ পাই। এক্ষণে 'মুক্তি নিকট' ভাবিয়া দলনী আহ্লাদিতা, কিন্তু কুল্‌সম্ নবাবের হাতে পড়িলে শাস্তি পাইবে ভাবিয়া আশঙ্কিতা। এই প্রসঙ্গে উভয়ের কথা-বার্ত্তায় মতভেদের পরিচয় থাকিলেও স্নেহের, আব্‌দারেরও পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উভয়ের মতভেদ আরও প্রবল হইল, দলনী মুসলমানের হাতে পড়িবার জন্য ইংরেজের নৌকা হইতে নামিলেন, 'কুল্‌সম্ কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই শুনিল না।' সে জীবনে এই প্রথম (ও শেষ) দলনীর প্রতি হৃদ্যতার অভাব দেখাইল। আমরা পরে দেখাইব, ভবিষ্যতে সে এ দোষের জন্য চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত (amende honorable) করিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি (৩ পৃঃ) যে কাবানাটকে 'সখীদিগের প্রেমে পড়িবার অবসর নাই, নায়িকার উত্তর-সাধিকার কার্য্য-সাধনেই তাঁহাদিগের কার্য্য পর্য্যবসিত'—ইহাই হইল সাধারণ বিধি। কিন্তু কুল্‌সম্ এই বিধি লঙ্ঘন করিয়াই দলনীর সঙ্গত্যাগ-রূপ অপকার্য্য করিল। কেননা, সে নবাবের হাতে শাস্তি পাইবার ভয়ে নৌকা হইতে নামিল না, আপাততঃ সে এই অজুহত দিয়াছে বটে, কিন্তু পরে সে আসল কারণ প্রকাশ

করিয়াছে,—"আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—"(ষষ্ঠ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ)। তবে আমরা পাঠক মহাশয়কে কাণে কাণে বলিতে পারি, ইহাও আসল কারণ নহে। আখ্যায়িকা-কার দলনীর জীবনকাব্য নিদারুণ শোকাবহ (tragic) করিবেন বলিয়াই এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

'সে কথা যাউক।' শেষে কুল্‌সম্ এই বিষম ত্রুটির কিরূপে সংশোধন করিল (যদিও তখন দলনী ডেস্‌ডেমোনার মত মানবের বিচারের অতীত), এক্ষণে সেই কথা বলি। তাহার নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি—"আমার স্কন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই,—কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইয়াছি—বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফষ্টরকে সাধিয়াছি যে, আমাকেও নামাইয়া দাও। কলিকাতায় গিয়া যাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকেই সাধিয়াছি যে, আমাকে পাঠাইয়া দেও। এখন তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর—আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।" কিন্তু এই তীব্র অনুতাপ প্রকাশ করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই, সে দলনীর জন্য সমবেদনায় এমন আত্মহারা হইয়াছিল যে অকুতোভয়ে মীরকাসেমকে 'মূর্খ' নবাব বলিল। তাহার সাহস, তাহার দৃঢ়তা, তাহার সত্যনিষ্ঠা, তাহার ন্যায়ানুরাগ, তাহার সমবেদনা, 'বাঁদী' কুল্‌সম্‌কে শেক্‌স্‌পীয়ারের এমিলিয়া-পলিনার গৌরবান্বিত আসনে স্থান দেয়। ফল-কথা, কুল্‌সম্ সর্ব্বসমক্ষে দলনীর সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিল (ষষ্ঠ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ), জন্ ষ্ট্যালকার্টকে লরেন্স ফষ্টর বলিয়া চিনাইয়া

দিল (৪র্থ পরিচ্ছেদ), এবং 'যোড় হস্তে, সজল নয়নে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"জাঁহাপনা! আমি এই আমদরবারে, এই পাপিষ্ঠ, স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন। সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।' (৭ম পরিচ্ছেদ)। ইহাই বাঁদী কুল্‌সমের অকৃত্রিম সখীত্বের জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

(১০) 'মৃণালিনী'তে গিরিজায়া

"মৃণালিনী'তে গিরিজায়া দাসীশ্রেণীর সখীত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে সে প্রথম হইতেই নায়িকার দাসী দূতী বা সখীর ভূমিকা লইয়া আসরে নামে নাই। প্রথমে আমরা যখন ভিখারিণীর দর্শন পাই, তখন সে নায়কের দূতী, গৌড়দেশে হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের বাটীতে হেমচন্দ্রের গুরুদেব মাধবাচার্য্য-কর্ত্তৃক লুকায়িতা নায়িকা মৃণালিনীর সন্ধানে নায়ক হেমচন্দ্র-কর্ত্তৃক নিযুক্তা। (১ম খণ্ড ৩য় ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ।) [শাস্ত্র-কারেরা বলিয়াছেন, নায়ক পুরুষ হইলেও তাহার দূতের পরিবর্ত্তে দূতী থাকিতে পারে—'নায়কানামপি দুত্যো ভবন্তি' ('সাহিত্য-দর্পণ,' ৩য় পরিচ্ছেদ)। পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর উল্লেখ আছে।] তাহার পর যেদিন প্রাতে গিরিজায়া মৃণালিনীর সন্ধান পাইল ও তাঁহার সহিত গোপনে প্রেমের মহাজন সম্বন্ধে

কথাবার্ত্তা কহিল, সেইদিন রাত্রে আবার সে হেমচন্দ্রের পত্রহারী দূতী হইয়া আসিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই রাত্রি হইতেই সে মৃণালিনীর 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী সখী'র পদে উন্নীত হইল। সে ব্যোমকেশের আক্রমণ হইতে মৃণালিনীকে রক্ষা করিল এবং হৃষীকেশ মৃণালিনীকে স্বৈরিণী-জ্ঞানে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলে, সে-ই মৃণালিনীকে তাহার সহিত পলাইয়া আসিতে বলিল, মৃণালিনীর আশ্রয়স্থল হইল, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল, হেমচন্দ্রের অনুসরণে নবদ্বীপে যাইতে পরামর্শ দিল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মৃণালিনীর সঙ্গে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল; এক দিনের পরিচয়েই মৃণালিনীর প্রতি যে মমতা হইয়াছে তাহা গোপন করিয়া নিজের নবদ্বীপ-যাত্রার অজুহত দিল, 'আমার সর্ব্বত্র সমান। রাজধানীতে ভিক্ষা বিস্তর'। মৃণালিনীও তাহাকে হিতৈষিণী বলিয়া বুঝিলেন। (১ম খণ্ড ৫ম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) ফল-কথা, আখ্যায়িকার প্রথম খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদেই সে নায়িকার পুরাদস্তুর সখী হইল।

তাহার পর, ২য় খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে উভয়ের দর্শন পাওয়া যায়। 'নৌকাযানে' তাহারা নবদ্বীপের নিকটে পৌছিয়াছে। 'নির্ব্বাসিতা, পরপীড়িতা, সহায়হীনা মৃণালিনী'র একমাত্র সহায় গিরিজায়া। সে মৃণালিনীর গভীর বিষাদ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে, দিবানিশি চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেছে; মৃণালিনীও প্রায় সকল কথা তাহাকে জানাইয়াছেন, উভয়ে ইতিকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন, বিষাদের মধ্যেও

গিরিজায়ার বাক্‌চাতুরীতে মৃণালিনীর ম্লানমুখে একবার হাসির রেখা ফুটিল; মৃণালিনীকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া গিরিজায়া 'সাধের তরণী' গীত গায়িল, মৃণালিনী তাহার উপর টিপ্পনী করিলেন। বুঝা গেল, উভয়ের সখীত্ব নিবিড়তর হইয়াছে।

৩য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে আবার উভয়ের দর্শন পাই। তখন উভয়ে এক পাটনীর কুটীরে আশ্রয় পাইয়াছেন। মৃণালিনী তেমনই গভীর-বিষাদগ্রস্ত, গিরিজায়ার কথা হইতে জানা যায় সে হেমচন্দ্রের সন্ধানের চেষ্টা করিতেছে, মৃণালিনী নিজ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া রোদন সম্বল করিয়াছেন। 'মৃণালিনী, উপাধানে মুখ লুকাইলেন। গিরিজায়ারও গণ্ডে নীরবস্রুত অশ্রু বহিতে লাগিল।' সমবেদনাময়ী সখীর কি সুন্দর চিত্র! পরক্ষণেই এই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে আশার আলোক ফুটিল। উভয়ে কুটীরদ্বারে আসিয়া বৃক্ষতলে (বটতলায়—বকুলতলায় নহে!) নিদ্রিত নায়ককে দেখিলেন। 'সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃণালিনী গিরিজায়াকে আলিঙ্গন করিলেন।' উভয়ে নিদ্রোত্থিত আহত গৃহাভিমুখী হেমচন্দ্রের 'অনুসরণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।'

পর-পরিচ্ছেদে গৃহাগত হেমচন্দ্রের প্রতি মনোরমার মমতা দেখিয়া উভয়ে চিন্তিত হইলেন, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেন, তাহার পর মৃণালিনী গিরিজায়াকে সংবাদ লইবার জন্য তথায় রাখিয়া কর্ত্তব্যবোধে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। "গিরিজায়া, আমি গৃহে চলিলাম, আমার আর থাকা উচিত

নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক, হেমচন্দ্র কেমন থাকেন সংবাদ লইয়া যাইও।” গিরিজায়া মৃণালিনীর কার্য্যে প্রাণ সঁপিয়া দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হেমচন্দ্র ও মনোরমাকে লক্ষ্য করিল, সে কতকগুলি ব্যাপার প্রেমের লক্ষণ মনে করিয়া মৃণালিনীর জন্য শঙ্কিত হইল। মৃণালিনীর জন্য তাহার দরদ রঙ্গতামাসার মধ্য হইতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ‘পাখিটীর জন্যে মৃণালিনী প্রতি রাত্রে কত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—আজি না জানি কতই কাঁদ্‌বে।’ (৩য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ)।

এই দরদের জন্য সে মৃণালিনীর আদেশ-মত শুধু হেমচন্দ্রের সুস্থতার সংবাদ লইয়াই ক্ষান্ত থাকিল না, সে চিরাভ্যস্ত ভিখারিণীর সাজে গান গায়িতে গায়িতে হেমচন্দ্রের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, ইচ্ছা বিরহিণীর সংবাদ দিয়া হেমচন্দ্রের মনোভাব বুঝিয়া লয়। কিন্তু সে স্ত্রী-বুদ্ধিতে হেমচন্দ্রকে মিথ্যা সংবাদ দিল (‘মৃণালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন’), আবার স্ত্রী-বুদ্ধিতে হেমচন্দ্রের উক্তি “গিরিজায়া, তোমার সংবাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে।”—শুনিয়াও ভুল বুঝিল। ‘গিরিজায়া ভিখারিণী বৈ ত নয়—কি বুঝিবে?’ সে (‘রাজসিংহে’র) নির্ম্মলকুমারীর মত নির্ম্মল উজ্জ্বল বুদ্ধি কোথায় পাইবে? যাহা হউক, বুদ্ধির দোষ হইলেও তাহার হৃদয় মৃণালিনীর জন্য কাতর হইল। (৩য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

কিন্তু গিরিজায়া মৃণালিনীর বেদনাবৃদ্ধির ভয়ে এসব কথা গোপন করিল, শেষে মৃণালিনীর ভাব দেখিয়া সব কথা খুলিয়া

বলিতে বাধ্য হইল (৩য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ)। মৃণালিনী বুঝিলেন, ইহা হেমচন্দ্রের ক্রোধের, অভিমানের কথা। তখন মৃণালিনী গিরিজায়াকে পত্র দিয়া হেমচন্দ্রের কাছে পাঠাইলেন। অনেক দিন পরে আবার সে পত্রহারী দূতী—তবে এবার নায়কের নহে, নায়িকার। হেমচন্দ্র ইত্যবসরে গুরুদেবের মুখে মৃণালিনীর অপবাদের কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং 'কুলটার' দূতী গিরিজায়াকে বেত্রাঘাতের ভয় প্রদর্শন করিলেন। 'গিরিজায়ার আর সহ্য হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, "বীরপুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ?—মৃণালিনী দূরে থাক্, তুমি আমারও যোগ্য নও।" এই বলিয়া গিরিজায়া সদর্পে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল।' তাহার এই সাহস, তেজস্বিতা, মৃণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের অন্যায় আচরণের জন্য প্রতিবাদ, সখীপ্রীতিই ইহার মূল। তাহার এই সাহস ও তেজ কুল্‌সমের কথা, তথা শেক্‌স্‌পীয়ারের এমিলিয়া-পলিনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পদাবলী-সাহিত্যে বৃন্দাদূতীও 'নিঠুর কপট শ্যাম'কে এমনি দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছে। ইহা গিরিজায়ার চরিত্রের বিশিষ্টতা। (৩য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)।

গিরিজায়ার মুখে সব কথা শুনিয়া মৃণালিনী 'কোন উত্তর করিলেন না। রোদনও করিলেন না।...দেখিয়া গিরিজায়া শঙ্কান্বিত হইল—তখন মৃণালিনীর কথোপকথনের সময় নহে বুঝিয়া তথা হইতে সরিয়া গেল।' কিন্তু সরিয়া গিয়া সে নিশ্চিন্ত

থাকিল না। সে বিষাদ-সঙ্গীত গায়িতে লাগিল, তাহার প্রভাবে মৃণালিনীর হৃদয় গলিল, মৃণালিনী কাঁদিলেন। গিরিজায়ার কৌশল সার্থক হইল। 'গিরিজায়া দেখিয়া হর্ষান্বিত হইলেন;—তিনি বুঝিতে পারিলেন যে যখন মৃণালিনীর চক্ষুতে জল আসিয়াছে—তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে।' মৃণালিনী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া গিরিজায়াকে সঙ্গে লইয়া হেমচন্দ্রের নিকট যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাবে যে গিরিজায়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহা নিজের অবমাননার কথা স্মরণ করিয়া নহে, মৃণালিনীর প্রতি অবিচার স্মরণ করিয়া। ইহা তাহার সখীপ্রীতিরই নিদর্শন। মৃণালিনীর উক্তি হইতে বুঝা যায়, মৃণালিনী তাহার গভীর স্নেহের উপলব্ধি করিয়াছেন। 'তুমি আমাকে ভগিনীর অধিক স্নেহ কর—তুমি আমার জন্য না করিয়াছ কি?' 'মৃণালিনী গিরিজায়ার স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিজায়াও রোদন করিল।' (৩য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)। গিরিজায়ার গভীর সমবেদনার কি সুন্দর চিত্র!

পর-পরিচ্ছেদে গিরিজায়া মৃণালিনীকে বাপীতীরে রাখিয়া হেমচন্দ্রকে সংবাদ দিতে আসিল। বড় করুণ কাহিনী, তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় শ্রীমতীর অভিসারের সহিত তুলনা দিব না। গিরিজায়া দৃঢ়তার সহিত, অনুযোগের সুরে, অথচ মৃণালিনীর প্রতি গভীর সমবেদনা-পূর্ণহৃদয়ে হেমচন্দ্রকে বলিল, "আমাকে বেত্রাঘাত করিতে সাধ থাকে, করুন। ঠাকুরাণীর জন্য এবার তাহা সহিব স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি।" প্রেমিক-

প্রেমিকা পরস্পরের সম্মুখীন হইল, 'গিরিজায়া অন্তরে গেল।' আর কৃষ্ণলীলার নজির তুলিব না।

তাহার পর মৃণালিনীর মুখে তাঁহার হৃষীকেশের গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রের পূর্ব্ব ধারণা দৃঢ় হইল, মৃণালিনীর মস্তক বক্ষশ্চ্যুত করিয়া তিনি দূতী গিরিজায়াকে 'পদাঘাতে পথ হইতে অপসৃতা করিলেন।' প্রাণ উৎসর্গ করিয়া 'ঠাকুরাণী'র কার্য্য-উদ্ধারের চেষ্টার উপযুক্ত পুরস্কার বটে! যাহা হউক, গিরিজায়া নিজের আঘাত তুচ্ছ করিয়া মৃণালিনীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণী, আঘাত কি গুরুতর বোধ হইতেছে?" (৩য় খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ)।

তাহার পর চতুর্থ খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে আবার আমরা উভয়ের দর্শন পাই। মৃণালিনী এখনও সেই বাপীতীরে প্রস্তর-সোপানে আহতা ও ব্যথিতা। গিরিজায়া সেই অবধি শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা করিতেছে। পরদিন 'নিকটস্থ বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্য মৃণালিনীকে দিল।—প্রসাদ গিরিজায়া ভোজন করিল,—ক্ষুধার অনুরোধে মৃণালিনীকে ত্যাগ করিল না।' রাত্রি হইল, মৃণালিনী উঠিবেন না বুঝিয়া সেইখানেই পত্রশয্যা রচনা করিল। কিছুতেই মৃণালিনীর অনুরোধে ঘরে ফিরিল না। মৃণালিনীকে তখন হেমচন্দ্রের অনুরাগিণী দেখিয়া সে মৃণালিনীকে ধমক দিল, হেমচন্দ্রকে গালি দিল, চলিয়া যাইব বলিয়া ভয় দেখাইল, কিন্তু এসব মৌখিক, অন্তরের টানে তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও গেল না।

পর-পরিচ্ছেদে আবার সে মৃণালিনীকে গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কোন ফল হইল না। মৃণালিনী হেমচন্দ্রের বিপদের ভয়ে উৎকণ্ঠিতা হইলেন, গিরিজায়ার নিকট সে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু 'গিরিজায়া কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহার নিদ্রা আসিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণালিনী দেখিলেন যে, গিরিজায়া ঘুমাইতেছে।' নারীর দুর্ব্বল দেহ অনিদ্রা-অনশনের কষ্ট আর কত সহিবে? ইহাতে যদি পাঠক হৃদয়হীনা বলিয়া গিরিজায়ার নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহার আশ্বস্তির জন্য জানাইতেছি, অচিরে মৃণালিনীরও তন্দ্রা আসিল। নিদ্রার আবেশে, স্বপ্নের ঘোরে, নায়ক-নায়িকার মধুরমিলন হইল, তখন সন্দেহের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। যাক্, সে সব অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া আর পুঁথি বাড়াইব না। 'গিরিজায়া মৃণালিনীর দুঃখের ভাগিনী হইয়াছিল, সহৃদয় হইয়া দুঃখের সময় কাহিনী সকল শুনিয়াছিল। আজি সুখের দিনে সে কেন সুখের ভাগিনী না হইবে? আজি সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত সুখের কথা কেন না শুনিবে? গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃণালিনী মহাধনীর কন্যা—উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দুঃখের দিনে গিরিজায়া মৃণালিনীর একমাত্র সুহৃৎ, সে সময়ে ভিখারিণী আর রাজপুরবধূতে প্রভেদ থাকে না; আজি সেই বলে গিরিজায়া মৃণালিনীর হৃদয়ের সুখের অংশাধিকারিণী হইল।' প্রকৃত সমদুঃখসুখ সখীজনের চিত্র বটে। আর মৃণালিনী যে এতদিন সব কথা তাহাকে বলেন নাই, সে বিশ্বাসের অভাব-

বশতঃ নহে, 'রাজপুত্রের নিষেধ ছিল বলিয়া।' এখন সে তারাইয়া তারাইয়া সব কথা শুনিল। এইখানেই এই অপূর্ব্ব সখীত্বের শেষ। (৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।) শেষই বা বলি কেন? মৃণালিনী রাজরাণী হইলে, 'গিরিজায়া মৃণালিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইলেন,' নিজস্ব স্বামী পাইয়াই স্বামিনীর প্রতি তাহার প্রীতির কর্ত্তব্য শেষ হইল না। (পরিশিষ্ট)।

আর একটা কথা বলিয়া গিরিজায়াকে বিদায় দিব। সখী গিরিজায়ার, কাব্যশাস্ত্রের সাধারণ নিয়মে, নায়িকার উত্তরসাধিকার কার্য্যেই সমস্ত পর্য্যবসিত নহে, অর্থাৎ সে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নহে,—কবি দিগ্‌বিজয়ের সহিত তাহার শুভ (?) পরিণয় ঘটাইয়াছেন। তবে মৃণালিনীর যখন আর সখী বা দূতীর প্রয়োজন নাই, তখনই ইহা ঘটিয়াছে, নির্ম্মলকুমারীর বিবাহের ন্যায় পূর্ব্বাহ্ণে ঘটে নাই; আর দিগ্‌বিজয়কে গিরিজায়া গ্রহণ করিল, দিগ্‌বিজয়ের প্রতি প্রেমের টানের জন্য যতটা না হউক, দিগ্‌বিজয় যে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয়-ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিল, সেই খাতিরে; অতএব ইহাও সখীপ্রীতির অন্যতম নিদর্শন। (৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ)। [শেক্‌স্‌পীয়ারের গ্র্যাসিয়ানো-নেরিসার কথা ও ১৮শ শতাব্দীর ইংরেজী কমেডির খানসামা-চাকরানীর কথা পূর্ব্বে (৪ পৃঃ) বলিয়াছি।]

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মৃণালিনীর প্রতি গিরিজায়ার স্নেহ-মমতা এত গভীর ও অকৃত্রিম, এই সখীত্বের চিত্র এত উজ্জ্বল,

এত সুন্দর, এত পূর্ণায়তন, যে তাহাকে তৃতীয় শ্রেণী হইতে প্রোমোশন দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে নির্ম্মলকুমারীর পার্শ্বে, এমন কি, ডবল প্রোমোশান দিয়া প্রথম শ্রেণীতে বসন্তকুমারীর পার্শ্বে বসাইতে ইচ্ছা করে। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন—'গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃণালিনী মহাধনীর কন্যা—উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দুঃখের দিনে...ভিখারিণী আর রাজপুরবধূতে প্রভেদ থাকে না।' 'জামাইবারিকে' ময়রাদিদি নিম্নশ্রেণীর হইলেও কি ধনিকন্যা কামিনীর সমদুঃখসুখা সখী নহে? [আর দুর্দ্দশায় পড়িয়া মৃণালিনী যে গিরিজায়াকে মাসের মাস বেতন যোগাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাও বোধ হয় না। (২য় খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)]। তথাপি গিরিজায়া যখন পুনঃ পুনঃ মৃণালিনীর দাসী (১৯) বলিয়া আপন মুখে কবুল করিয়াছে এবং শেষেও সে মৃণালিনীর 'পরিচর্য্যায় নিযুক্তা', তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে দাসী-শ্রেণীতেই ধরিলাম।

(১৯) 'আমি তোমার দাসী হইয়াছি' (২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ), 'আমি মৃণালিনীর দাসী' (৩য় খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ), 'আমি ত মৃণালিনীর দাসী' (৪র্থ খণ্ড ১০ম পরিচ্ছেদ)।)

দ্বিতীয় শ্রেণী

এইবার দ্বিতীয় শ্রেণীর সখীদিগের বিষয়ে আলোচনা করিব। এই শ্রেণীর মোটে তিনটি দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে দৃষ্ট হয়। (১) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অম্বররাজ মানসিংহের অন্যতমা মহিষী উর্ম্মিলা দেবীর সখী বিমলা, (২) 'কপালকুণ্ডলা'য় যুবরাজ সেলিমের প্রধানা মহিষীর সখী লুৎফউন্নিসা, এবং (৩) 'রাজসিংহে' *রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর সখী নির্ম্মলকুমারী।* পূর্ব্বেই বলিয়াছি (২৯ পৃঃ), ইঁহারা বৃত্তিভোগিনী হইলেও, সামান্যা পরিচারিকা বা দাসী নহেন; ইঁহারা ভদ্রবংশজা এবং রাজমহিষী বা রাজকন্যার সহিত অনেকটা সমানভাবে মিশিতে সমর্থা।

(১) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা

'দুর্গেশনন্দিনী'তে মানসিংহ-মহিষী উর্ম্মিলাদেবীর সহিত বিমলার সখীত্বের রীতিমত চিত্র নাই; বিমলার পত্রে এই সখীত্বের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনামাত্র আছে (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ)। বিমলা লিখিতেছেন—"উর্ম্মিলার গুণ তোমার নিকট কত পরিচয় দিব? তিনি আমাকে সহচারিণী দাসী বলিয়া জানিতেন না; আমাকে প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জানিতেন।··· ... তাঁহারই মনোরঞ্জনার্থে নৃত্যগীত শিখিলাম। তিনি আমাকে স্বয়ং লেখাপড়া শিখাইলেন।"

যাহা হউক, এক্ষেত্রে সামাজিক পদবীতে উর্ম্মিলাদেবী প্রধানা

ও বিমলা অপ্রধানা হইলেও, কাব্য-বর্ণিত ব্যাপারে বিমলা প্রধানা, উর্ম্মিলা অপ্রধানা ; অর্থাৎ উর্ম্মিলাদেবীর অম্বররাজের সহিত প্রণয়-ব্যাপারে বিমলা 'নায়িকা-সহায়িনী' নহেন, বিমলার বীরেন্দ্র-সিংহের সহিত গুপ্তপ্রণয়-লীলায় উর্ম্মিলাদেবী 'নায়িকা-সহায়িনী।' বীরেন্দ্রসিংহ অন্তঃপুরে গুপ্ত-প্রণয় করিতে আসিয়া মানসিংহ-কর্তৃক কারাগারে আবদ্ধ হইলে, বিমলা উর্ম্মিলাদেবীর শরণ লইলেন। "আমি কাঁদিয়া উর্ম্মিলাদেবীর পদতলে পড়িলাম ; আত্মদোষ সকল ব্যক্ত করিলাম।......উর্ম্মিলাদেবী আমার প্রাণরক্ষার্থ মহারাজের নিকট বহুবিধ কহিলেন।" (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।) এক্ষেত্রে সখীত্বের কার্য্য এই পর্য্যন্ত।

(২) 'কপালকুণ্ডলা'য় লুৎফউন্নিসা

'রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী, যুবরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যুবরাজ লুৎফউন্নিসাকে তাঁহার প্রধানা সহচরী করিলেন। লুৎফউন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।' (৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।) অতএব এক্ষেত্রে লুৎফউন্নিসা আপাত-দৃষ্টিতে বেগমের সখী হইলেও, প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার প্রতিযোগিনী। তথাপি 'লুৎফউন্নিসা আত্মপ্রাধান্য-রক্ষার জন্য', আকবরের মৃত্যুর পরে যাহাতে সেলিমের পরিবর্ত্তে বেগমের গর্ভজাত খস্রু সিংহাসন লাভ করে, তজ্জন্য খস্রুজননীকে প্ররোচিত করিলেন এবং তাঁহার সহিত একাভিসন্ধি হইয়া রাজনীতিক ষড়যন্ত্রে সোৎসাহে যোগ

দিলেন। উভয়েরই গূঢ় উদ্দেশ্য, সেলিমের হৃদয়ের উপর মেহের-উন্নিসার ভবিষ্যৎ প্রভাব যাহাতে না ঘটে। 'বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আগ্রায় যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে।......" শুধু এই লোভে লুৎফউন্নিসা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।' (৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।) যাহা হউক, এই রাজনীতিক ষড়যন্ত্রে সখীত্বের মনোরম চিত্রের আশা করা যায় না। ব্যাপারটিও অপ্রধান। কেবল আলোচনার সম্পূর্ণতার জন্য এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইল।

(৩) 'রাজসিংহে' নির্ম্মলকুমারী

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আমলে লিখিত এই দুইখানি আখ্যায়িকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সখীর তেমন সুন্দর আদর্শ মিলিল না। কিন্তু তাঁহার শেষ বয়সে 'পুনঃপ্রণীত' 'রাজসিংহে' এই শ্রেণীর সখীর চিত্র অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল, অতি মনোরম। বাস্তবিক, নির্ম্মলকুমারী সখীকুলশিরোমণি। তাঁহার সখীত্বের চিত্র আখ্যায়িকার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং এই চিত্রের আলোচনাও বর্ত্তমান পুস্তকের অনেকটা স্থান অধিকার করিবে। তবে আশা করি, এই মনোরম চিত্রের আলোচনা দীর্ঘ হইলেও তাহাতে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

প্রথম পরিচ্ছেদেই, ভারতচন্দ্রের বীরসিংহ রাজার কন্যার ন্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বিক্রমসিংহ রাজার কন্যার 'এক পাল' ('দশ জন কি পনর জন') 'যুবতী' 'সখীজন এবং দাসী', 'রঙ্গপ্রিয়া বয়স্যা ও পরিচারিকা'র উল্লেখ আছে। কিন্তু 'কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষাহারে দ্যুতিমান্ মধ্যমণি যেমন সুন্দর', তেমনই এই সখীমালার মধ্যে 'নির্ম্মল-নাম্নী একজন বয়স্যা' উজ্জ্বলতমা, 'চঞ্চলের সহোদরাধিকা অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী।'

প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, চঞ্চল যখন আলমগীর বাদশাহের তস্‌বীরের উপর লাথি মারিবার অসমসাহসিক প্রস্তাব করিলেন, তখন একজন সখী বলিল, 'অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী।' একটু পরেই বুঝা যায়, এ নিষেধ নির্ম্মলের, কেন না পরেই স্পষ্ট নাম নির্দ্দেশ করিয়া বলা আছে, নির্ম্মল-নাম্নী এক বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।" আবার যখন (২য় পরিচ্ছেদে) চঞ্চলকুমারী 'নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সখি নির্ম্মল!...আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—" নির্ম্মল রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন।' এইরূপে রাজকন্যাকে নিবারণ করিবার পুনঃপুনঃ চেষ্টায়ই নির্ম্মল ক্ষান্ত হইল না, সে উপস্থিতবুদ্ধি-বলে তস্‌বীরওয়ালীর মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে ঘুঁষ দিল ও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল, "আয়ি বুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই—এখনও উহার

ছেলে বয়স।" (২০) (২য় পরিচ্ছেদ।) বুঝা গেল, নির্ম্মল শুধু 'অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী' নহে, রাজকন্যার 'পরমা হিতৈষিণী'; যাহাতে রাজকন্যার ভবিষ্যতে অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বথা সচেষ্ট। ইহা সূচনামাত্র। আমরা পরে দেখিব, নির্ম্মল চঞ্চলের জন্য কতটা ত্যাগস্বীকার, কতটা প্রাণপাত পরিশ্রম করিবে।

নির্ম্মল গম্ভীরভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে জানে, অথচ সে 'পরিহাসে' 'নর্ম্মবিজ্ঞানে'ও অভিজ্ঞা। (অলঙ্কার-শাস্ত্রে সখীর লক্ষণ স্মর্ত্তব্য।) প্রথম পরিচ্ছেদে যখন 'হাসির গোল পড়িয়া গেল', কিন্তু রাজকুমারীর আবির্ভাবে 'হাসির ধূম কম পড়িয়া গেল', তখনও 'এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না... যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল।' অনুমানে বুঝি, এই 'সুন্দরী' 'যুবতী' নির্ম্মলকুমারী, কেননা 'মধুর সরস হাসি' (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) তাহার সিদ্ধবিদ্যা। ইহাও সূচনামাত্র। আমরা এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখিব নির্ম্মল কেমন পরিহাস-রসিকা। সে ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিতে চায় এই কথা লইয়া মজা করিল, চঞ্চলের রাজসিংহের প্রতি পূর্ব্বরাগের আঁচ পাইয়া তাঁহাকে 'জ্বালাতন' করিতে লাগিল। অথচ সে রাজকন্যার দরদের

(২০) এই চঞ্চলমতির জন্যই চঞ্চলকুমারী নামকরণ। নির্ম্মলকুমারী ও 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা অনেক কার্য্য করিয়াছে যাহা সাধারণ মাপকাঠীতে বিচার করিলে ঠিক বলিয়া সামাজিকগণ মানিবেন না, অথচ উভয়েরই চরিত্রে কোন প্রকৃত দোষ নাই, এইটি বুঝাইবার জন্য কবি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহাদিগের এরূপ নাম রাখিয়াছেন।

দরদী, মরমের মরমী। যখন (২য় পরিচ্ছেদে) চঞ্চল রাজসিংহের 'চিত্র হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন', তখন 'একজন সখী তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল' (অনুমানে বুঝি এ নির্ম্মলকুমারী) ; রাজকুমারী বলিলেন, "দেখ ! দেখিবার যোগ্য বটে।" নির্ম্মলের মুখ চাহিয়াই রাজকুমারী বলিলেন, "সখি নির্ম্মল !...আমার সাধ কি মিটিবে না ?" ইহা হইতে বুঝা যায় নির্ম্মলকে হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া রাজকন্যার জ্বালা জুড়ায়। সে 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী পার্শ্ব-চারিণী সখী'।

তৃতীয় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে যোধপুরীর দেবী চাকরাণী মতিওয়ালীর ছদ্মবেশে আসিয়া রাজকুমারীর সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে চাহিলে রাজকুমারী বলিলেন, 'নির্ম্মল থাক, আর সকলে বাহিরে যাও।' ইহা হইতেও বুঝা গেল, সে কত-দূর বিশ্বাসপাত্রী, তাহার সহিত রাজকুমারীর কতটা অন্তরঙ্গ ভাব।

চিত্রদলনের পর চিত্র-বিচারণ-কালে (৩য় পরিচ্ছেদে) 'এক-খানা কার ছবি' লুকাইয়া লুকাইয়া রাজকুমারীকে 'পাঁচবার করিয়া' দেখিতে দেখিয়া নির্ম্মল তাঁহাকে একটু 'জ্বালাতন' করিল। চঞ্চলকুমারী লজ্জায় মনের কথা চাপিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শেষে রঙ্গপ্রিয়া অথচ স্নেহময়ী সখীর নিকট সব কথা বলিয়া ফেলিলেন। নির্ম্মল ভাবোন্মত্তা নবপ্রণয়মগ্নার কথা শুনিয়া বলিল, 'বল কি রাজকুমার ? ছবি দেখিয়া কি এত হয় ?'

আমরা অবশ্য অতটা বিস্মিত হই নাই, কেননা 'বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখালে আনি' এই মহাজন-বাণী আমাদের 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশি'য়াছে। যাহা হউক, এক্ষেত্রে নির্ম্মল বিশাখার ন্যায় ছবি আঁকিয়া দেখাইলেন না বটে, কিন্তু ছবি দেখিয়া রাজকন্যার কিরূপ ভাবাবেশ হইয়াছে, তাহা বুঝিলেন। ('প্রেমের কথা' পুস্তকের ২৯-৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) এই পূর্ব্বরাগের বেশী আর প্রথম খণ্ডে কিছু নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু এইটুকু আছে, বাদশাহ রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য সৈন্য পাঠাইতেছেন, বিক্রমসিংহের নিকট এই 'রাজাজ্ঞা' (mandate) পৌছিলে সকলের 'আনন্দের সীমা রহিল না', কেবল 'চঞ্চলকুমারীর সখীজন নিরানন্দ'। (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) সাধারণ-ভাবে সখীজনের কথা আছে, নির্ম্মলের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই।

তৃতীয় খণ্ডে ইহার বিশদ বিবৃতি আছে, নির্ম্মলের সখীত্বের উজ্জ্বল চিত্র আছে। 'নির্ম্মল ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতে-ছেন।...নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিল, বলিল, "এখন উপায়?"' সে রাজকন্যাকে দিল্লী যাইতে, 'পৃথিবীশ্বরী' হইতে পরামর্শ দিল (যদিও জানিত 'ও পথে কিছু হইবে না'), তাহার পর 'আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার যদি করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল।' চঞ্চল দিল্লীযাত্রায় স্বীকৃত না হইলে তাঁহার পিতার কি বিপদ্ হইবে নির্ম্মল তাহার উল্লেখ করিলে,

চঞ্চল দিল্লীযাত্রার পর দিল্লীর পথে বিষ খাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন নির্ম্মল বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই?" চঞ্চল রাজসিংহের আশ্রয় লইবার প্রস্তাব করিলেন, নির্ম্মল অনেক ভাবিয়া সম্মতি দিল এবং রুক্মিণীর যদুপতির শরণ লওয়ার ন্যায় চঞ্চলকুমারীর রাজসিংহের শরণ লওয়া সম্বন্ধে সখীজনোচিত পরিহাস করিল। নির্ম্মল নিজে বৃন্দাদূতী সাজিয়া গেল না, উভয়ের পরামর্শ হইল, গুরুদেবকে দিয়া পত্র পাঠান। এই উপলক্ষে নির্ম্মল আবার একটু পরিহাস করিল,"সে ত অনেক কাল জানি।" সকল কথা বলিতে চঞ্চলের লজ্জা করিবে বলিয়া নির্ম্মল গুরুদেবকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার ভার লইল। পরিহাস-কালে 'নির্ম্মল হাসিল' বটে, কিন্তু তাহার পর সে যখন উঠিয়া গেল, তখন 'কাঁদিতে কাঁদিতে গেল'। (৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।) বুঝা গেল, নির্ম্মল কত সমবেদনাময়ী এবং রাজকুমারীর সহিত তাহার কত একাত্মতা; উভয়ে একাভিসন্ধি হইয়া পরামর্শ করিল।

পর-পরিচ্ছেদে গুরুদেব অনন্ত মিশ্র যখন বলিলেন, "রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?" তখন নির্ম্মল রাজকুমারীর লজ্জানিবারণের জন্য সে ভার লইল, তাহার পর 'চঞ্চল ও নির্ম্মল দুইজনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল।' এখানেও সেই একাত্মতা। আমরা পরে দেখিব (৩য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ), পত্রের একটা 'পুনশ্চ' ছিল সেটা নির্ম্মলের মুন্সীআনা; চঞ্চলকুমারীর লজ্জারক্ষার জন্য, তাঁহার

চরিত্রের মর্য্যাদারক্ষার জন্য, সখী এ ভার লইয়াছেন, 'সলজ্জা নবযৌবনা' নায়িকা স্বহস্তে এটুকু লিখিতে পারেন নাই।

যখন মোগলসৈন্য রাজকুমারীকে লইতে আসিল, তখন 'নির্ম্মলের মুখ শুকাইল। দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখী?...রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সখি?"' সখীর জন্য এই উৎকণ্ঠা হইতে বুঝা যায়, নির্ম্মলের স্নেহ কেমন অকৃত্রিম। 'রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুইজনে দুইজনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাই।' সমবেদনাময়ী সখী শুধু কাঁদিয়াই ক্ষান্ত হইল না, রাজকুমারীর সঙ্গে যাইতে চাহিল, তিনি কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। 'নির্ম্মল বলিল,"তুমি আমাকে লইয়া যাও, বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব—কেহ রাখিতে পারিবে না।" দুইজনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।' (৩য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।) ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। আমরা পরে দেখিব, কিরূপে নির্ম্মল নিজ প্রতিজ্ঞা রাখিল।

৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে সখীদ্বয়ের করুণ বিদায়দৃশ্য। 'নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল; চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমাণ অশ্রুজল চক্ষুমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, "রত্নালঙ্কার পরাই সখি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।"...নির্ম্মল...কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।' এ যেন

শকুন্তলার বিদায়দৃশ্য। চঞ্চল বলিল, "নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না!" নির্ম্মল কিন্তু বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।"...'নির্ম্মল...চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।' আমরা ৫ম খণ্ডে দেখিব, কিরূপে নির্ম্মল তাহার প্রতিজ্ঞা রাখিল। এই অটল সঙ্কল্প হইতে তাহার সখীত্বের গভীরতা বুঝা যায়। 'তার পর একে একে সখীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গণ্ডগোল করিল।' এই ত গেল সাধারণ সখীদিগের কথা। আর নির্ম্মল? 'চঞ্চল ত চলিয়া গেল।...কিন্তু নির্ম্মলের কান্না ত থামে না। একা—একা—একা—শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা। নির্ম্মল উচ্চ গৃহচূড়ার উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল... কতক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া ছাদের উপর হইতে নামিল।...নির্ম্মল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। পরে দৃঢ়পদে, অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।' সে 'অগাধ জলে ঝাঁপ' দিল। (৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।) তাহার সখীর প্রতি অনুরক্তি (devotion) অনসূয়া-প্রিয়ংবদা অপেক্ষাও অধিক নহে কি?

এই খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে পথ-চলায় অনভ্যস্তা নির্ম্মলকুমারী 'পথের ধারে বৃক্ষের ছায়ায় পড়িয়া আছে' মাণিকলাল দেখিল;

নির্ম্মল পরিচয় দিল; (২১) রাজকুমারীর কাছে যাইতেছিল, সে কথাও জানাইল। তাহার পর, মাণিকলালের সহিত তাহার যেরূপ যোজনা হইল, পাঠকবর্গের তাহা অবিদিত নাই। এই যোজনা পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ। কেননা সখীর কার্য্য (function) ও প্রয়োজনীয়তার আলোচনা-কালে (৩ পৃঃ) বুঝাইয়াছি, সখীকে প্রেমে পড়িতে নাই, ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। গিরিজায়া স্বামী গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তখন তাহার সখীর কার্য্য ফুরাইয়াছে। পক্ষান্তরে, এক্ষেত্রে নির্ম্মলের এত শীঘ্র, সখীর কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিতে, প্রেমের ফাঁদে পা দেওয়া অনেকের ভাল লাগিবে না। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে পাঠক মহাশয়ের রাগটা জল হইয়া যাইবে। গ্রন্থকার বুঝিয়াছিলেন, এই উপায় ভিন্ন নির্ম্মলকে নিরাপদে চঞ্চলের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় না। তাই এই কৌশলটি উদ্ভাবন করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল, এক্ষেত্রে সখীর প্রণয় ও পরিণয় উভয় সখীর ভবিষ্যৎ পুনর্মিলনের উপায়-স্বরূপ (means to an end); কবির চরম (ultimate) উদ্দেশ্য, উভয় সখীর পুনর্মিলন। তাহা আমরা ৫ম খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে দেখিব। নায়কের সহচরের সহিত নায়িকার সখীর বিবাহ হইল,

(২১) নির্ম্মল বলিল, "আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।" এই 'দাসী' শব্দ বিনয় (humility) প্রকাশ করিতেছে। সে সত্য সত্যই হারাণী বা ক্ষীরির মত দাসী অর্থাৎ চাকরানী নহে, তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর। 'নির্ম্মল কখনও পথ হাঁটে নাই' এই কথা হইতেই বুঝা যায় যে, সে দাসীশ্রেণীর নহে।

(গিরিজায়া-দিগ্‌বিজয় তুলনীয়) পূর্ব্বে (৪ পৃঃ) এ তত্ত্বটুকু বুঝাইয়াছি। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই—প্রথম-পরিচয়ে এক পক্ষ বলিলেন ‘আমি রাণা রাজসিংহের ভৃত্য’, অপর পক্ষ বলিলেন ‘আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।’—কবি এইরূপ কথালাপ সংযোজিত করিয়াছেন।

মাণিকলালের গৃহিণী হইয়া নির্ম্মল চঞ্চলকুমারী-সম্বন্ধে মাণিক-লালের প্রমুখাৎ সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, তাহার পর (৫ম খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে) নির্ম্মল চঞ্চলকুমারীকে রাজসিংহের অন্তঃপুরে দেখিতে আসিলেন। ‘অনেক দিনের পর নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল-কুমারী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। সে দিন নির্ম্মলকে যাইতে দিলেন না। নির্ম্মলের সুখ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আহ্লাদিতা হইলেন।’ চঞ্চলকুমারী বলিল, “আমার সঙ্গে আমার একটি চেনা লোক নাই। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকিতে পারি না। যদি ভগবান্ তোমাকে মিলাইয়াছেন, তবে তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।” এই ত গেল এক পক্ষের কথা। ইহা হইতে বুঝা গেল, চঞ্চল-কুমারীর নির্ম্মলকুমারীর প্রতি কত গভীর প্রীতি, কত প্রাণের টান।

‘পক্ষান্তরে, নির্ম্মল চঞ্চলকুমারীর দুঃখ শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল।’ ইত্যাদি। ইহাতে বুঝা গেল নির্ম্মলের সখীর জন্য সমবেদনা কত গভীর। কিন্তু চঞ্চলকুমারীর প্রস্তাব ‘শুনিয়া প্রথমে নির্ম্মলের বোধ হইল যেন বুকের উপর পাহাড়

ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সে সবে স্বামী পাইয়াছে—নূতন প্রণয়, নূতন সুখ, এসব ছাড়িয়া কি চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া থাকা যায়?' নির্ম্মলকুমারী হঠাৎ সম্মত হইতে পারিল না। চঞ্চলকুমারীর চক্ষে একটু জল আসিল; বলিল, "নির্ম্মল, তুমি আমার জন্য একা পদব্রজে রূপনগর হইতে চলিয়া আসিয়া মরিতে বসিয়াছিলে! আর আজ! আর আজ তুমি স্বামী পাইয়াছ!" নির্ম্মল অধোবদন হইল।' এই জন্যই বলিয়াছি (৩ পৃঃ), কাব্য-নাটকে সখীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের, দাম্পত্য-জীবনের স্থান নাই, নায়িকার সুখ-দুঃখে সমবেদনাবোধেই তাহার সকল কার্য্য পর্য্যবসিত। নির্ম্মল সেই মামুলি পথ ছাড়িয়াই ফাঁফরে পড়িয়াছে। এক্ষণে তাহার হৃদয়ে পতিপ্রেম ও সখীত্বে তুমুল দ্বন্দ্ব (conflict) উপস্থিত হইল। সুখের বিষয়, অবশেষে সখীত্বই জয়ী হইল, তাহার সখীর কার্য্য বজায় থাকিল, সে আবার 'বিশ্বাস-বিশ্রাম-কারিণী সখী'র পদে বাহাল হইল। পর-পরিচ্ছেদেই তাহার পরিচয় পাই।

সখীর কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার প্রথম কার্য্য, জ্যোতিষীর নিকট চঞ্চলকুমারীর ভাগ্যগণনা করান। চঞ্চল-কুমারীর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য নির্ম্মলের দারুণ উৎকণ্ঠা, সেই উৎকণ্ঠা-বশতঃই তাহার এই উদ্যম। (৫ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।)

জ্যোতিষী গণিয়া বলিলেন, 'যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখন তোমার সখীর পরিচর্য্যা করে, তখন বিবাহ হইবে।' এই জ্যোতিষী-গণনার সূত্র ধরিয়া বিস্ময়কর অভাবনীয়

ঘটনা-পরম্পরার, অর্থাৎ রোম্যাণ্টিক উপকরণের আবার নূতন করিয়া উৎপত্তি হইল। চঞ্চলকুমারীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে নির্ম্মলকুমারী উদিপুরীকে চঞ্চলকুমারীর তামাকু সাজার নিমন্ত্রণ করিতে দিল্লীতে বাদশাহের রঙ্‌মহালে যাইতে, অসমসাহসিক কার্য্যের ভার লইতে বাধ্য হইল। এই উপলক্ষে সখীদ্বয়ের একটু রঙ্গরস হইল (ষষ্ঠ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ)। তাহার পর, নির্ম্মল কিরূপে স্বামীর সহিত গুপ্ত-পরামর্শ করিল, রঙ্‌মহালে যোধপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, উদিপুরীকে পত্র দিল, বাদশাহের কাছে ধরা পড়িয়া বন্দী হইল, মাণিকলালের সহিত কৌশলে পত্র-বিনিময় করিল, ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনায় পুথি বাড়াইতে চাহি না। যুদ্ধ বাধিলে নির্ম্মল কৌশলে উদিপুরীকে বন্দী করাইয়া রাজসিংহের অন্তঃপুরে চঞ্চলকুমারীর নিকট পৌছাইয়া দিল (৭ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ) ও 'আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন।' (৮ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ)। ফল-কথা, নির্ম্মল যে কার্য্যের ভার লইয়াছিল তাহা অদ্ভুত সাহস ও বুদ্ধিকৌশলের প্রভাবে সুসিদ্ধ করিল। সখীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া কঠিন কার্য্য উদ্ধার করা তাহার গভীর সখীপ্রীতির সুন্দর নিদর্শন।

ইহার পর নির্ম্মল একবার রাজকুমারীর অনুমতি লইয়া তাঁহার কাছছাড়া হইল, শিবিরে গিয়া বাদশাহের একটা বিশেষ উপকার করিল (৮ম খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ)। ইহার সহিত আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সংযোগ নাই।

উদিপুরী দ্বারা তামাকু সাজান হইয়া গেলে অর্থাৎ জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইলে, উভয় সখীতে মিলিয়া মহারাণার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে পরামর্শ হইল। 'কৈ, রাণা ত কিছু বলেন না। চঞ্চলকুমারী কাঁদিতেছে দেখিয়া নির্ম্মল আসিয়া কাছে বসিল। মনের কথা বুঝিল, নির্ম্মল বলিল, "মহারাণাকে কেন কথাটা স্মরণ করিয়া দাও না ?"' চঞ্চলের তাহাতে লজ্জা হইল, নির্ম্মল অগত্যা তাঁহাকে পিত্রালয়ে যাইতে পরামর্শ দিল। 'চঞ্চল কি উত্তর করিতে যাইতেছিল। উত্তর মুখ দিয়া বাহির হইল না— চঞ্চল কাঁদিয়া ফেলিল। নির্ম্মলও কথাটা বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়াছিল। চঞ্চল, চক্ষুর জল মুছিয়া, লজ্জায় একটু হাসিল। নির্ম্মলও হাসিল। তখন নির্ম্মল হাসিয়া বলিল' ইত্যাদি। এইরূপ হাসি-কান্নার মধ্যে নির্ম্মল আবার 'মুন্‌শীআনা' করিয়া পত্র লেখাইল, কালোচিত সুপরামর্শ দিল, সঙ্গে-সঙ্গে রঙ্গরসও একটু আধটু চলিল। এইভাবে আবার দুই সখীতে একাভিসন্ধি হইয়া কার্য্য করিলেন। পরে পত্রের উত্তর আসিলে উত্তরের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া উভয়ে চিন্তাকুল হইলেন। (৮ম খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।) নির্ম্মলের এই সমবেদনা-প্রকাশ ও পরামর্শদান সখীত্বের শেষ চিত্র।

তাহার পর, মুস্কিল-আসান হইল, রাণা রাজসিংহ বিক্রম সোলাঙ্কির হস্ত হইতে তাঁহার কন্যা চঞ্চলকুমারীকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। (৮ম খণ্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।) কিন্তু ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় এ সব ব্যাপারের তেমন গুরুত্ব নাই, সুতরাং

গ্রন্থকার সামান্য ইঙ্গিত দিয়াই শেষ করিয়াছেন, এবং সখীর প্রসঙ্গ আর একেবারেই উত্থাপন করেন নাই। 'রাধারাণী'র শেষ পরিচ্ছেদে নায়িকার বিবাহকালে নায়িকার সখী বসন্তকুমারী আসিলেন, আসিয়া রাধারাণীর সহিত রঙ্গরস করিলেন, ইত্যাদি ভাবের বর্ণনা ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার উপসংহারে আশা করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত নির্ম্মল-কুমারী যে ভাবে চঞ্চলকুমারীর 'বিশ্বাস-বিশ্রাম-কারিণী সখী'র কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই মনোরম। সখীর এই চিত্র অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল। এরূপ অভাবনীয় ঘটনা-পরম্পরায় সখীত্বের বিকাশ প্রাচীন সাহিত্যে দুর্লভ। ইহার মৌলিকতা স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রথম শ্রেণী

এইবার প্রথম শ্রেণীর সখীদিগের চিত্র আলোচনা করিব। যে চিত্রগুলি গ্রন্থকার অল্পে সারিয়াছেন, অগ্রে সেইগুলির আলোচনা করিয়া পরে পূর্ণায়তন চিত্রগুলির আলোচনা করিব।

(১) বিমলা ও আশ্‌মানি

'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা জগৎসিংহকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার শেষার্দ্ধে (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ) বিবৃত আছে যে, মানসিংহের মহিষী উর্ম্মিলাদেবীর আশ্‌মানি-নাম্নী এক পরিচারিকা ছিল। বিমলাও উক্ত উর্ম্মিলাদেবীর সখী (বা 'সহচারিণী দাসী') ছিলেন। অর্থাৎ আশ্‌মানি বিমলার পরিচারিকা নহে, উভয়েই উর্ম্মিলাদেবীর বৃত্তিভোগিনী, সুতরাং উভয়ের সখীত্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নহে, প্রথমশ্রেণীভুক্ত। (২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) বিমলা লিখিয়াছেন—'আশ্‌মানির সহিত আমার বিশেষ সম্প্রীতি ঘটিল; আমি তাহাকে প্রভুর সংবাদ আনিতে পাঠাইলাম। সে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দিয়া আসিল। প্রত্যুত্তরে তিনি আমাকে কত কথা কহিয়া পাঠাইলেন,...আমি আশ্‌মানির হস্তে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম, তিনিও তাহার প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটিতে লাগিল।' বুঝা গেল, এক্ষেত্রে আশ্‌মানি পত্রহারী বা সন্দেশহারিকা দূতীর কার্য্য করিয়াছে।

তাহার পর, আবার বীরেন্দ্রসিংহ আশ্‌মানির সাহায্যে ও 'সমভিব্যাহারে বারি-বাহক দাস সাজিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া' নিশাকালে বিমলার শয়নকক্ষে দর্শন দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে আশ্‌মানি বিমলার সমবেদনাময়ী সাহায্যকারিণী সখী। যাহা হউক, বৃত্তান্তটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, তাহাও আবার পত্রে বিবৃত, রীতিমত চিত্রিত নহে।

পরে উভয়ে বীরেন্দ্রসিংহের অন্তঃপুরে বাস করিয়াছিল, তখনও তাহাদের পূর্ব্বের হৃদ্যতা ছিল, তবে পাছে জগৎসিংহ আশ্‌মানিকে চিনিতে পারেন, এই জন্য বিমলা জগৎসিংহের নিকট যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে ল'ন নাই। দিগ্‌গজহরণ-ব্যাপারে উভয়ের হৃদ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। (১ম খণ্ড ১১শ, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ পরিচ্ছেদ।)

(২) লুৎফউন্নিসা ও মেহেরউন্নিসা

'কপালকুণ্ডলা'য় লুৎফউন্নিসা ও মেহেরউন্নিসা পরস্পরের 'বাল্যসখী'। ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে মতিবিবি (লুৎফ-উন্নিসা) বলিতেছেন—'মেহেরউন্নিসাকে আমি কিশোর বয়োহবধি ভাল জানি। মেহেরউন্নিসা আমার বাল্যসখী'। আবার ঐ খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে জানা যায়, 'মেহেরউন্নিসার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। পরে উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্য প্রতি-যোগিনী হইয়াছিলেন।' অনুমান হয় যে, এক সময়ে তাঁহারা শেক্‌স্‌পীয়ারের হার্ম্মিয়া-হেলেনার ন্যায় পরস্পরের নিবিড় প্রীতি-

বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন, পরে হার্ম্মিয়া-হেলেনার মতই প্রেমের প্রতিযোগিতায় সেই নির্ম্মল প্রীতি বিকৃত ঈর্ষ্যা-কলুষিত হয়। (১১-১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) ৩য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, 'সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহেরউন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।'

পুস্তকের একটি-মাত্র পরিচ্ছেদে উভয় সখীকে একত্র দেখা যায়। মতিবিবি (লুৎফউন্নিসা) রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপার সমাধা করিয়া উড়িষ্যা হইতে ফিরিবার পথে সেলিম (জাঁহাগীর) বাদশাহ হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া 'মেহেরউন্নিসার চিত্ত জাঁহাগীরের উপর কিরূপ' তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে 'প্রতিযোগিনী-গৃহে' যাইবার সঙ্কল্প করিলেন, কেননা বাদশাহ মেহেরউন্নিসাকে বিবাহ করিলে লুৎফউন্নিসা প্রতিযোগিনীর নিকট হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন। (৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে) পেষ্‌মনের সহিত মতিবিবির কথালাপে এই উদ্দেশ্য জানা যায়।

পর-পরিচ্ছেদে (৩য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদে) উভয় সখীর বহুকাল পরে দেখা হইল, মতি বিবি 'অত্যন্ত সমাদরে' গৃহীত হইলেন। কিন্তু ব্যাপারটা শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি। মতিবিবির ভিতরে-ভিতরে জানিবার উদ্দেশ্য—'মেহেরউন্নিসার চিত্ত জাঁহাগীরের উপর কিরূপ', আবার মেহেরউন্নিসা ভাবিতেছিলেন, "দেখি, লুৎফউন্নিসা কি কিছু প্রকাশ করিবে না?" 'মেহেরউন্নিসা খাসকামরায় বসিয়া তসবীর লিখিতেছিলেন। মতি মেহেরউন্নিসার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্রলিখন দেখিতেছিলেন এবং

তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন।' ইত্যাদি। এ যেন মৃণালিনী-মণিমালিনীর মুসলমানী সংস্করণ!

প্রথমে উভয়ের কথাবার্ত্তায় সখীস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। মেহেরউন্নিসা বলিতেছেন, 'তুমি যে আমাকে কাল প্রাতে ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাই বা কি প্রকারে ভুলিব? আর দুই দিন থাকিয়া তুমি কেনই বা চরিতার্থ না করিবে?...আমার প্রতি তোমার ত ভালবাসা আর নাই, থাকিলে তুমি কোন মতে রহিয়া যাইতে।' তাহার পর সেলিমের প্রণয়ের কথা লইয়া তিনি সখীকে একটু পরিহাস করিলেন, একটু খোঁচাও দিলেন। এই ভাবে কথাবার্ত্তা অনেকক্ষণ চলিল। (পাঠকবর্গকে সমগ্র পরিচ্ছেদটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।) মতিবিবি স্নেহের সুরেই মেহেরউন্নিসাকে সেলিমের কথা বলিলেন, তাহার পর তিনি যখন সেলিমের সিংহাসনারোহণের সংবাদ দিলেন, তখন আর মেহেরউন্নিসা হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না, আবেগভরে সেলিমের প্রতি গাঢ় অনুরাগ অকপটে প্রকাশ করিলেন। 'মেহেরউন্নিসা আর কিছু শুনিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মেহেরউন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?" মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল।' তাহার পর, মতিবিবির প্রশ্নে তিনি প্রকৃত মনোভাব বিশদ-ভাবে প্রকাশ করিলেন, সেলিমকে কি বলিতে হইবে তাহা স্পষ্টবাক্যে বলিয়া দিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে মতিবিবি যেন বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী সখী বা সন্দেশহারিকা দূতী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা প্রতিযোগিনী, সুতরাং এই চিত্র আপাত-মনোরম হইলেও অকৃত্রিম সখীত্বের নিদর্শন নহে। বিমল সখী-প্রীতি এক্ষেত্রে প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা কলুষিত বিকৃত হইয়াছে। 'মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল,'—এই কথাই ইহার শেষ কথা। কৌশলে মেহেরউন্নিসার চিত্ত জানিবার জন্যই মতিবিবি এই হৃদ্যতার ভান করিয়াছিলেন। ইহা সখীত্ব নহে, সখীত্বাভাস।

(৩) মৃণালিনী ও মথুরার রাজকন্যা

'মৃণালিনী'তে নায়িকা মৃণালিনী মথুরার রাজকন্যার সখী ছিলেন। মৃণালিনী 'পূর্ব্ব পরিচয়' দিতেছেন (৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ)—"আমার পিতা......অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন—মথুরার রাজকন্যার সহিত আমার সখীত্ব ছিল।" মৃণালিনী যখন ধনিকন্যা, তখন তিনি অবশ্যই রাজকন্যার বৃত্তিভোগিনী ছিলেন না, সুতরাং এ 'সখীত্ব' প্রথমশ্রেণীভুক্ত। যাহা হউক, এই 'সখীত্বে'র কোনও চিত্র নাই, কেবল মথুরার রাজকন্যার সহিত জলবিহারে গিয়া মৃণালিনী নৌকাডুবিতে জলমগ্ন হইলে হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে উদ্ধার করিলেন এবং উদ্ধারের ফলে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল, ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ (উক্ত পরিচ্ছেদে) আছে। এই ঘটনা ঘটাইবার জন্যই মথুরার রাজকন্যার সহিত জলবিহারের অবতারণা। সুতরাং এই 'সখীত্বে'র প্রসঙ্গ এক কথাতেই শেষ করিলাম।

(৪) মৃণালিনী ও মণিমালিনী

মৃণালিনী যখন গৌড়নগরে হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের গৃহে 'পিঞ্জরের হঙ্গী' তখন তিনি হৃষীকেশ-কন্যা মণিমালিনীর সহিত 'স্নেহ-কলে' অর্থাৎ সখীত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন ; অল্প দিনের পরিচয় লেও এই স্নেহ অকৃত্রিম। ১ম খণ্ডের ২য়, ৩য় ও ষষ্ঠ রচ্ছেদে এই সখীত্বের চিত্র আছে, বিশেষতঃ ২য় পরিচ্ছেদে। পরিচিত স্থানে মণিমালিনীর সখীত্বই মৃণালিনীর একমাত্র বলম্বন ছিল। তাহার পর, মৃণালিনী হৃষীকেশের গৃহ হইতে তাড়িত হইলে এই সখীত্বের আর অবসর ঘটে নাই, কেবল রিশিষ্টে' জানা যায় যে এই সখীত্ব দীর্ঘকাল পরস্পরের অদর্শনেও টুট ছিল, Out of sight out of mind হয় নাই। ণালিনী...মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন। ণমালিনী রাজপুরী মধ্যে মৃণালিনীর সখীস্বরূপে বাস করিতে গিলেন। তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত ইলেন।' (শেষ বাক্য হইতে বুঝা গেল, সখী মণিমালিনী াব্যের উপেক্ষিতা' নহেন !)

১ম খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, এই 'দুইটী তরুণী ক্ষ প্রাচীরে আলেখ্য লিখিতেছিলেন' ও কথোপকথন করিতে-লেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু নায়িকা চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী। ঙ্কমচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে আখ্যায়িকা-রচনায় প্রবৃত্ত ইলেও এক্ষেত্রে মৃণালিনীর চিত্রবিদ্যা-পটুতার বেলায় সংস্কৃত

সাহিত্যের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। (২২) মৃণালিনী চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শিনী, মণিমালিনী শিক্ষানবিশ। মণিমালিনী কি আঁকিতেছিলেন উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতে তাহা জানা যায়, কিন্তু মৃণালিনী কি আঁকিতেছিলেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তিনি *যদি বিরহাবস্থায়* হেমচন্দ্রের প্রতিকৃতি আঁকিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঠিক সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরূপ হইয়াছে, কেননা উক্ত সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার বিরহকালে প্রেমাস্পদের প্রতিকৃতি-অঙ্কন 'বিনোদোপায়'। (মেঘদূতে 'মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী' স্মর্ত্তব্য।)

'সখীর কার্য্য ও প্রয়োজনীয়তা'র আলোচনা-কালে (৩-৪ পৃঃ) বলিয়াছি, সখীর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের, পারিবারিক জীবনের প্রসঙ্গ কাব্য-নাটকে স্থান পায় না ইহাই সাধারণ নিয়ম হইলেও কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ সখী সুভাষিণী ও সখীস্থানীয়া ননন্দা কমলমণি ও শ্যামার উল্লেখও তথায় করিয়াছি। এক্ষেত্রেও সখী মণিমালিনীর স্বামিসুখের (?) প্রসঙ্গ এই পরিচ্ছেদের কথোপকথনে একটু-আধটু আছে, তবে মণিমালিনী সে কথায় বড় অঙ্গ দেন নাই। না দিয়া ভালই করিয়াছেন, কেননা নায়িকা

(২২) তবে ইংরেজী সাহিত্যে অনেক স্থলে নায়িকাকে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী দেখা যায়। উক্ত সাহিত্যে বহুতর স্থলে নায়িকাকে সেলাই-কার্য্যে ব্যাপৃতা দেখা যায়। মৃণালিনীও সূচিকর্ম্মনিপুণা ছিলেন। ২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ('কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে জানি।')

ৃণালিনীর পূর্ব্ববৃত্ত-বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়াই এখানে কবির উদ্দেশ্য। তিনি সুকৌশলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। ('মেঘনাদবধ' কাব্যে সীতা ও সরমার কথোপকথন স্মর্ত্তব্য।) পাঠকবর্গকে সমগ্র ২য় পরিচ্ছেদটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে উভয় সখীর বিশ্রম্ভালাপ তথা নর্ম্মালাপের নিদর্শন পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গেপরস্পরের অকৃত্রিম স্নেহেরও পরিচয় পাওয়া যায়। 'এ ত মৃণালিনী নহে যে স্নেহ-শিকলে বাঁধিয়া রাখিব।' 'তোমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসি।' 'আমি তোমাকে ভালবাসিব, বাসিয়াও থাকি।' মণিমালিনীর এই সকল উক্তি এবং 'কেবলমাত্র তুমি আমার সখী—তুমি আমাকে ভাল না বাসিলে কে আর ভালবাসিবে?' মৃণালিনীর এই উক্তি উভয়ের গভীর প্রীতির প্রমাণ। মৃণালিনীর পূর্ব্ববৃত্ত শুনিয়া মণিমালিনী অনুযোগ করিলেন, 'তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?'—ইহা স্নেহের অনুযোগ, বিচারকের তীব্র তিরস্কার-বাক্য নহে। মৃণালিনীও মণিমালিনীকে ভাল-বাসিতেন বলিয়া ইহাতে ব্যথা পাইলেন এবং স্নেহময়ী সখীর খারাপ ধারণা দূর করিবার জন্য, তাহাকে অন্য কাহারও কাছে কথাটা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া ও তজ্জন্য শপথ করাইয়া গুহ্যকথা (হেমচন্দ্রের সহিত চৌরিকাবিবাহের কথা) বলিলেন। (২৩) এই শপথ করানর ব্যাপার হইতেও পরে মণিমালিনী

(২৩) মৃণালিনী মণিমালিনীর কাণে কাণে কি বলিলেন, পাঠক

দ্বারা ভিখারিণীর জন্ত ভিক্ষা আনাইবার ছলে তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে পাঠাইয়া গিরিজায়ার নিকট হেমচন্দ্রের সংবাদ লওয়ার ব্যাপার হইতে বুঝা যায় যে মৃণালিনী সখীকে পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তিনি একটু আশঙ্কিতা পাছে মাধবাচার্য্যের শিষ্যকন্তা কর্ত্তব্যবোধে এ সব গুপ্ত কথা আপন পিতাকে জানায়। উভয়ের পরিচয়ও ত বেশী দিনের নহে; সুতরাং এ অবস্থায় এরূপ আশঙ্কা স্বাভাবিক। যদিও ইহা 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী' সখীর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত মিলে না, কিন্তু তথাপি মণিমালিনী 'সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ'। মণিমালিনী যখন ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই ভিখারিণীকে কাণে কাণে কি বলিতেছিলে?" তখন মৃণালিনী ছড়া কাটিয়া রঙ্গব্যঙ্গ করিয়াই সারিয়া লইলেন, মণিমালিনীও সেই রঙ্গব্যঙ্গে যোগ দিলেন। কথাটা ঐ ভাবেই চাপা পড়িল।

যাহা হউক, উভয়ের হৃদয়ের এইটুকু ব্যবধান থাকিলেও উভয়ের স্নেহপ্রীতি অকৃত্রিম। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে হৃষীকেশ যখন মৃণালিনীকে দুশ্চরিত্রা মনে করিয়া সেই রাত্রেই তাঁহাকে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন, তখন এমন বিপদে এত

বিকাশের জন্ত অবলম্বিত একটি কাব্যকৌশল। 'দুর্গেশনন্দিনী'তেও ঠিক অনুরূপ কৌশল আছে। জগৎসিংহ যখন দুর্গস্বামীর অনুরোধ ব্যতীত দুর্গপ্রবেশে আপত্তি করিলেন, তখন বিমলা তাঁহাকে কাণে কাণে নিজের

অপমানেও মৃণালিনী হৃষীকেশের কন্যা ও পাষণ্ড ব্যোমকেশের ভগিনী 'সখী মণিমালিনীর নিকট বিদায়' না লইয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। হৃষীকেশ কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলে, 'এবার মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিল।' এতক্ষণ তিনি কাঁদেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, মণিমালিনীর প্রতি তাঁহার স্নেহ কত গভীর।

আবার মণিমালিনীর স্নেহও সমান গভীর। 'প্রাঙ্গণভূমে দ্রুতপাদবিক্ষেপিণী মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই, অমন করিয়া এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ?" মৃণালিনী কহিলেন, "সখি মণিমালিনি, তুমি চিরায়ুষ্মতী হও। আমার সহিত আলাপ করিও না। তোমার বাপ মানা করেছেন।" মণি। "সে কি মৃণালিনী! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সর্ব্বনাশ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বলিয়াছেন! সখি, ফের। রাগ করিও না।" মণিমালিনী মৃণালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না।...তখন অতি ব্যস্তে মণিমালিনী পিতৃসন্নিধানে আসিলেন'—এই অত্যাহিতের প্রতি-বিধানের চেষ্টায়। মৃণালিনীর তৎক্ষণাৎ গিরিজায়ার সহিত গৃহত্যাগে অবশ্য সকল চেষ্টাই পণ্ড হইয়াছিল। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, হৃষীকেশ পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া পুত্রের পক্ষপাতী হইলেন ও পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিলেন, পুত্রের দোষ দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু মণিমালিনী ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হইলেন না, 'ভ্রাতার

ইহাও তাঁহার গভীর সখীপ্রীতির প্রমাণ। ফলতঃ এই চিত্র ক্ষুদ্র হইলেও হৃদয়গ্রাহী ও উজ্জ্বল-মধুর।

(৫) মৃণালিনী, গিরিজায়া ও রত্নময়ী

মৃণালিনী যেমন গৌড়নগরে হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের বাটীতে বাসকালে গৃহস্বামীর কন্যা মণিমালিনীর সহিত অল্পদিনের পরিচয়েই সখীত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি আবার নবদ্বীপে পাটনীর গৃহে বাসকালে 'পাটনীর যুবতী কন্যা *রত্নময়ী'র সহিতও অল্পদিনের পরিচয়েই সখীত্বসূত্রে* বদ্ধ হইয়াছিলেন; তবে তখন তিনি গভীর দুঃখে বিকলচিত্ত, গিরিজায়া বহু চেষ্টায় তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে প্ররোচিত করিত, সুতরাং রত্নময়ীর সহিত মৃণালিনীর সাক্ষাৎসম্বন্ধ তেমন স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় নাই, গিরিজায়ার সাহচর্য্য ও সাহায্যেই তাঁহার সখীর প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। আর অভিজাত-তনয়া মৃণালিনী অপেক্ষা ভিখারীর মেয়ে গিরিজায়ার সহিতই পাটনীর কন্যা রত্নময়ীর মাখামাখি বেশী হইয়াছিল, কেননা তাহারা অনেকটা সমান সামাজিক শ্রেণীর। যাহা হউক, মৃণালিনীর সহিত রত্নময়ীর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তেমন সখীত্ব না থাকিলেও গিরিজায়ার সহিত উভয়ের সখীত্ব থাকাতে ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ-অনুসারে এই সখীত্ব স্বীকার করিতে হইবে! রত্নময়ী যখন হেমচন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণি, উনি

সব কথা তাহার কাছে ভাঙ্গিলেন না। (৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।) ইন্দিরাও সব কথা হারাণীর কাছে ভাঙ্গেন নাই—বোধ হয়, একই কারণে—সে এমন অভাবনীয় ঘটনায় বিশ্বাস করিবে না বলিয়া। ইহার পরে রত্নময়ীর আর বার্ত্তা পাওয়া যায় না। তথাপি বলিব, তাহাকে একেবারে সখী-হিসাবে অগ্রাহ্য করা চলে না, বাদ দেওয়া যায় না। 'পরিশিষ্টে' দেখা যায়—'রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের নূতন রাজ্যে গিয়া বাস করিল। তথায় মৃণালিনীর অনুগ্রহে তাহার স্বামীর বিশেষ সৌষ্ঠব হইল। গিরিজায়া ও রত্নময়ী চিরকাল "সই" "সই" রহিল।' (এক্ষেত্রেও গ্রন্থকার তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অতএব সে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নহে !)

একটিমাত্র পরিচ্ছেদে (৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদে) সখীত্বের চিত্র থাকিলেও গিরিজায়ার সহিত রত্নময়ীর রঙ্গব্যঙ্গটুকু বেশ অম্লমধুর। 'র। "সই ?" গি। কি সই ? র। তুমি কোথা সই ? গি। বিছানাসই। র। গায়ে জল দিব সই। গি। জলসই ? ভাল সই, তাও সই।···র। কথায় সই তুমি চিরজই···আর মিলাইতে পারি কই ?···তোমার মুখে ছাই।'···(২৪) এই দাশুরায়ী ধরণের

---

(২৪) এই দুই সখীর ছড়াকাটা ও (১ম খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে) মৃণালিনী ও মণিমালিনীর ছড়াকাটা "সই মনের কথা সই, মনের কথা সই......সই কথা কোস কথা কব নইলে কারো নই" "হ'লি কিলো সই ?" "তোমারই সই"—৺দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী'তে (২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য)

পাঁচালীর 'ছাই'মুঠাটাও মিষ্ট। অতএব এ চিত্রও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে।

(৬) কুন্দ ও চাঁপা

পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৭ পৃঃ ১১ নং পাদটীকায়) বঙ্কিমচন্দ্র 'মন্দভাগিনী চিরদুঃখিনী' কুন্দনন্দিনীকে একেবারে সখীভাগ্যে বঞ্চিত করেন নাই। বাল্যে পিতৃবিয়োগের পরেই তাহার 'সমবয়স্কা ও সঙ্গিনী' চাঁপাকে তাহার পার্শ্বে বসাইয়াছেন। চাঁপা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, কুন্দও তাহাকে অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—'চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা ও সঙ্গিনী। চাঁপা আসিয়া কুন্দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল যে কুন্দ কোন কথাই কহিতেছে না, রোদন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রত্যাশা-পন্নবৎ আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছে। চাঁপা কৌতূহল-প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এক শ বার আকাশপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ?" কুন্দ তাহাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যন্ত বলিল এবং পরে নগেন্দ্র দত্তকে দেখিয়া চাঁপাকে দেখাইল, "এই সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ।"' ('বিষবৃক্ষ', ৪র্থ পরিচ্ছেদ।) স্বপ্নবৃত্তান্ত উভয় সখীর কথাপ্রসঙ্গে কৌশলে পাঠকবর্গের গোচর করিবার জন্য কবি বাল্যসখীর অবতারণা করেন নাই, কেননা কবি ইহা নিজেই পূর্ব্ব

কে আছে আর তোমা বই।......"হাঁ সই, আমি কি কেউ নই" স্মরণ

পরিচ্ছেদে বিবৃত করিয়াছেন। তবে কুন্দ যে কতদূর অসামান্ত সরলা, স্বপ্নবৃত্তান্তে সম্পূর্ণ বিশ্বাসপরায়ণা, কবি চাঁপার সহিত কুন্দর কথাবার্ত্তায় কৌশলে এইটুকু বুঝাইয়াছেন। যাহা হউক, তথাপি বলা যাইতে পারে যে কবি, ভবভূতি ও মাইকেল মধুসূদনের মত, করুণাপরবশ হইয়াই এই দারুণ শোকের সময় বালিকা কুন্দ-নন্দিনীর একজন সখীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, এক দণ্ড জুড়াইবার স্থান মিলাইয়াছেন। ইহার পর কুন্দ অন্যত্র নীতা, আর তাহার সারাজীবনে চাঁপার সহিত দেখা হয় নাই। তবে সদ্যঃ সদ্যঃ অপরিচিত স্থানে গিয়া সে কমলমণির স্নেহযত্ন পাইয়া কতকটা সুস্থ ও শান্ত হইয়াছিল, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। (৫ম পরিচ্ছেদ।)

(৭) কুন্দ ও কমলমণি

যৌবনকালে যখন কুন্দ প্রণয়ের ব্যথায় কাতর, তখন আবার কবি করুণা-পরবশ হইয়া কমলমণিকে ক্ষণেকের তরে তাহার সমবেদনাময়ী সখীর ভূমিকা গ্রহণ করাইয়াছেন। যথাস্থানে (১৭ পৃঃ ১১ নং পাদটীকায়) ইহারও আভাস দিয়াছি। নগেন্দ্রনাথ বালিকা কুন্দকে কলিকাতা লইয়া গেলে কমলমণি তাহাকে ছোট বোনটির মত যত্ন-আর্ত্তি করিলেন, ইহা অবশ্য সখীত্বের চিত্র নহে। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সূর্য্যমুখীর যাতনার সংবাদ জানিয়া এবং তাঁহার অনুরোধপত্র পাইয়া কমলমণি যখন গোবিন্দ-

হইলেন, তখন তিনি যে কৌশলে কুন্দর মনোভাব জানিবার জন্য তাহার প্রতি (লুৎফউন্নিসার প্রতি মতিবিবির মত) স্নেহের ভান করিলেন তাহা নহে, তিনি প্রকৃতই কুন্দকে ভালবাসিলেন। আর কুন্দও যে 'বোকা মেয়ে' বলিয়া, হীরার মৌখিক যত্ন-আদরের মত, কমলমণির স্নেহের ভান দেখিয়া ভুলিয়া গেল তাহা নহে, উভয় পক্ষেই প্রকৃত ভালবাসা ঘটিল। 'কমলের যে প্রকৃতি চির-*প্রেমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই* তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক কতক ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রণয় গাঢ় হইল।' (১৪শ পরিচ্ছেদ।)

'কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।......কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।' তাহার পর কমলমণি কুন্দকে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা যাইতে বলিলেন এবং 'সস্নেহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই দাদা-বাবুকে বড় ভালবাসিস্—না?" কুন্দ উত্তর দিল না। কমল-মণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।' তাহার পর যখন কমলমণি তাহাকে বুঝাইলেন এই ভালবাসায় কত অনিষ্ট হইতেছে, তখন 'ঘুরিয়া কুন্দের উন্নত মস্তক আবার কমলমণির

ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল। ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল।' (১৪শ পরিচ্ছেদ।) ইহা 'সমদুঃখ-সুখ সখীজনে'র চিত্র নহে কি? যদিও কমলমণি সূর্য্যমুখীর সুখের জন্য সতত সচেষ্ট, এবং সূর্য্যমুখীর 'কণ্টক উদ্ধারের' জন্যই কুন্দকে কলিকাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, তথাপি তিনি এক্ষেত্রে কুন্দর প্রতি পূর্ণ সমবেদনা দেখাইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে।

আবার (১৭শ পরিচ্ছেদে) সূর্য্যমুখী কুন্দকে কর্কশভাষায় গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলিলে, 'কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয়নগৃহে লইয়া গেলেন। শয়নগৃহে থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন।' পরে তিনি সূর্য্যমুখীকে বুঝাইলেন যে কুন্দ-সম্বন্ধে দেবেন্দ্র দত্তর কুৎসা বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং পলায়িতা কুন্দর সন্ধানে সচেষ্ট হইলেন। (২০শ পরিচ্ছেদ।) ইহাও কুন্দর প্রতি পূর্ণ সমবেদনার পরিচায়ক।

(৩১শ পরিচ্ছেদে) বিধবা-বিবাহ ও সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর নগেন্দ্রের ব্যবহারে ও সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে ব্যথিতহৃদয়া কুন্দ 'আজিকার মর্ম্মপীড়া, সহৃদয়া স্নেহময়ী কমলমণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। সেদিন, প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময়, কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া চক্ষের জল

মুছাইয়া দিয়াছিলেন—সেই দিন মনে করিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিতে গেলেন। কমলমণি কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—…কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে।' এ ক্ষেত্রে কমলমণির সমবেদনার উৎস শুকাইয়াছে, সূর্য্যমুখীর গভীর বেদনা ও গৃহত্যাগের জন্য তিনি মর্ম্মপীড়িতা, তাঁহার সূর্য্যমুখীর প্রতি প্রীতি এখন সর্ব্বাতিশায়িনী।

কিন্তু (৪৩শ পরিচ্ছেদে) আবার যখন কমলমণি গোবিন্দপুরে আসিলেন, তখন তিনি আবার পূর্ব্ববৎ কুন্দর প্রতি স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী। 'যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন।' এবার আবার তিনি সমবেদনাময়ী সখীর কার্য্য করিলেন।

শেষে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকালে 'কমলমণি ভয়নিক্লিষ্ট-বদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং অতিব্যস্তে নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন।' এবং তাহার জন্য 'উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।' (৪৮শ ও ৪৯শ পরিচ্ছেদ।) ইহার উল্লেখ না করিলেও চলে—কেননা তখন সপত্নী সূর্য্যমুখী পর্য্যন্ত সমবেদনায় পূর্ণহৃদয়া, 'চিরপ্রেমময়ী' কমলমণির ত কথাই নাই।

কমলমণি প্রধানতঃ সূর্য্যমুখীর স্নেহময়ী ননন্দা বা সখীর ভূমিকাগ্রহণের জন্যই পরিকল্পিতা। তথাপি তিনি উল্লিখিত স্থলগুলিতে কুন্দনন্দিনীরও সমদুঃখসুখা সখীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা এই শতদল কমলের পাপড়িতে পাপড়িতে সঞ্চিত প্রীতি-মধুর পরিচয়, এই 'চিরপ্রেমময়ী'র সর্ব্বত্রপ্রসারী প্রেম-স্নেহের নিদর্শন। তাই ('কাব্যসুধা'য়) 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে ভাব-গদগদ-চিত্তে বলিয়াছি, 'কমলমণি আমার favourite, আমি চিরদিনই কমলমণির গুণপক্ষপাতী। কমল সত্যই সোণার কমল, নারীরত্ন। তাই সে প্রস্ফুটিত শতদল কমল (full-blown Rose)।' যাক্, সখীর চিত্র-বিচারে এই উচ্ছ্বাস বর্জ্জনীয়। এই চিত্র নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, এবং সুন্দর ও উজ্জ্বল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

(৮) হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী

কুন্দ-কমলের এই রোম্যাণ্টিক চিত্রের পরে হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনীর (realistic) বাস্তব চিত্রের আলোচনা করিব। তিনটি পরিচ্ছেদে (১৯শ, ২২শ, ৩৬শ) আমরা 'গঙ্গা-জলের' দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করি। ১৯শ পরিচ্ছেদে শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়াই হীরা বুঝিল ইহা বাবুর বাড়ীর দ্বারবানের শিকল নাড়া নহে, 'তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না'.......'এ শিকল বলিতেছে' "কিট্ কিট্ কিটী! দেখি কেমন আমার হীরেটি!" ইত্যাদি। ইহা হইতে আমরাও বুঝিতে

পারি, উভয়ের গলায় গলায় ভাব। মালতী নিতান্ত নোংরা ব্যাপারে দূতীর কার্য্য করে। (তাহার ব্যবসায়ের ঠিক নাম-নির্দ্দেশ করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না। 'সই' 'বেগুন-ফুল' প্রভৃতি অভিধা ছাড়িয়া 'গঙ্গাজল' অভিধায় তাহার চরিত্র-সম্বন্ধে গূঢ় ব্যঙ্গ—Irony—লক্ষণীয়।) সে হীরাকে বলিল "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে।" ইহার অর্থ হীরা বুঝিল। রতনে রতন চেনে। দুই সখী—অভিসারিকা ও দূতী 'গলা মিলাইয়া' দেশকালপাত্রোপযোগী 'গীত গায়িতে গায়িতে চলিল'। যাহা হউক, এক্ষেত্রে দেবেন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, হীরা গোড়ায় একটু ভুল বুঝিয়াছিল।

তাহার পর, '*হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু ঘন ঘন যাতায়াত হইতে লাগিল।*' (২২শ পরিচ্ছেদ।) হীরার সঙ্গে তাহার গলায় গলায় ভাব থাকিলেও এই যাতায়াত কিন্তু সখী-প্রীতির ফল নহে। মালতী দেবেন্দ্র বাবুর কার্য্য-উদ্ধারের জন্য কৌশলে কুন্দকে হীরার ঘরে আবিষ্কার করিল এবং দেবেন্দ্রকে সংবাদ দিল। এরূপ চরিত্রের স্ত্রীলোকের সখীপ্রীতি অপেক্ষা স্বার্থানুরাগই প্রবল।

যাহা হউক, আবার ৩৬শ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্র 'মালতী দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন।' এবার মালতীর কার্য্যটি তাহার ব্যবসায়ের হিসাবে। যাহা হউক, এই বাস্তব চিত্রের আর আলোচনা করিব না। শুধু আলোচনার সম্পূর্ণতার জন্য ইহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

এই আলোচনায় যে আটখানি চিত্রের বিচার করিলাম, ইহার মধ্যে শেষেরটি (realistic) বাস্তব চিত্র-হিসাবে উল্লেখযোগ্য—এইমাত্র। বাকী সাতখানির মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও নগণ্য; কিন্তু মৃণালিনী ও মণিমালিনীর সখীত্বের চিত্র ক্ষুদ্র হইলেও উজ্জ্বল ও মনোরম, গিরিজায়া ও রত্নময়ীর সখীত্বের চিত্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর, এবং কুন্দর সহিত কমলমণির সখীত্বের চিত্র নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, এবং সুন্দর ও উজ্জ্বল। এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর অবশিষ্ট কয়েকখানি চিত্রের বিচার করিব; সেগুলি এগুলি অপেক্ষা *পূর্ণায়তন ও হৃদয়গ্রাহী*।

(৯) রাধারাণী ও বসন্তকুমারী

রসমঞ্জরীতে দূতীর লক্ষণনির্দ্দেশে 'তস্যাঃ সংঘট্টন-বিরহ-নিবেদনাদীনি কর্ম্মাণি' এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু ধরিতে গেলে 'সংঘট্টন' অর্থাৎ নায়কের সহিত নায়িকার মিলন ঘটাইয়া দেওয়া সখীরও একটি কার্য্য। রাধারাণীর সহিত বসন্তকুমারীর সখীত্বে এই তত্ত্ব স্ফুটীকৃত। (রসিক পাঠক হয় ত বলিবেন, মদনের সহায় বসন্ত !)

রাধারাণীর দারিদ্র্যের দিনে মাতা ও কন্যা পরস্পরের ভালবাসা ও সমবেদনার চিত্র আছে, কিন্তু তখন তাঁহার সখীর ব্যবস্থা নাই। তাহার পর কামাখ্যা বাবুর গৃহে রাধারাণীর মাতার মৃত্যু হইয়াছিল; তখন অবশ্যই কামাখ্যাবাবুর কন্যা বসন্তকুমারী (কুন্দর বেলায় চাঁপা অপেক্ষাও) সহৃদয়তার সহিত রাধারাণীকে সান্ত্বনা

দিয়াছিলেন, কিন্তু কবি সে প্রসঙ্গ তোলেন নাই। রাধারাণী পূর্ব্বরাগের সূত্রপাতেও সখীর নিকট সাহায্য ও সান্ত্বনা পান নাই (চঞ্চলকুমারীর মত সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই), কেননা তখনও তিনি কামাখ্যাবাবুর গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করেন নাই। তাহার পর, রাধারাণী যখন 'পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী', তখন বাল্যবিবাহদ্বেষী 'নব্যতন্ত্রের লোক' কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইলেন ও তাহার 'মনের কথা জানিবার জন্য আপনার কন্যা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।' (৩য় পরিচ্ছেদ)। এই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই যথাসময়ে (তাহার একটুও পূর্ব্বে নহে) বসন্তকুমারীর সখীত্বের অবতারণা। বালিকা-বয়সেই পূর্ব্বরাগের সূত্রপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এতদিন পাঠকের নিকট প্রকাশ পায় নাই, এই পিতাপুত্রীর কথোপকথন-উপলক্ষে পাইল। অবশ্য পূর্ব্বেই রাধারাণী মনের কথা প্রাণের ব্যথা ব্যথার ব্যথী সখীকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পাঠক সে বিশ্রব্ধালাপ আড়ি পাতিয়া শুনিবার অবকাশ তখন পান নাই, এখন পাইলেন। ছোট গল্প বলিয়া গ্রন্থকার সখীত্বের ইতিহাস ফলাও করিয়া বর্ণনা করেন নাই। এইজন্যই রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে যখন কোন ফল হইল না, তখনও নির্ম্মলকুমারীর ন্যায় বসন্তকুমারী কি ভাবে নায়িকাকে সান্ত্বনা দিলেন, চঞ্চলকুমারীর ন্যায় রাধারাণী কি ভাবে সখীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন, সে সকল বাহুল্য-বর্ণনা নাই।

'সখীর কার্য্য ও প্রয়োজনীয়তা'র আলোচনাকালে (৩ পৃঃ) বলিয়াছি, সখীর নিজস্ব সুখদুঃখের কথা কাব্যে স্থান পায় না,

ইহাই সাধারণ নিয়ম। এক্ষেত্রে বসন্ত বিবাহিতা কি কুমারী, সধবা কি বিধবা, তাহা পর্য্যন্ত পাঠককে জানান কবি আবশুক বিবেচনা করেন নাই। যাক্, এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

'বসন্তের সহিত রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়।' 'বসন্ত সলজ্জভাবে, অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে' রুক্মিণীকুমার-ঘটিত বিবরণ…'পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল' এবং বলিল "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। সেই রাত্রি অবধি, রুক্মিণী-কুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই, যেদিন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই।" (৩য় পরিচ্ছেদ।) এই শেষ বাক্যটী লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছিলাম, রাধারাণী পূর্ব্বেই 'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী' সখী বসন্তকুমারীকে মনের কথা, প্রাণের ব্যথা জানাইয়াছিল. কিন্তু কবি তখন সে বিশ্রব্ধালাপ পাঠকের গোচর করা আবশুক মনে করেন নাই।

রাধারাণী প্রথম-দর্শনেই সাবিত্রীর ন্যায় (!) রুক্মিণীকুমারকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাইবার 'সম্ভাবনা কিছুই নাই' তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াও তদ্গতচিত্তা। এই বিরহোৎকণ্ঠিতা অবস্থায়ই সখীর সাহচর্য্যের অধিক প্রয়োজন, বসন্তকুমারীর অবতারণায় সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। যাহাতে

নায়িকা অভীষ্ট নায়ককে পাইতে পারেন, তজ্জন্য সখী বিধিমত চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না, তাহার জন্য পিতার নিকট একটু প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এ নির্লজ্জতা যে রাধারাণীর উপকারার্থ। পিতাপুত্রীর এ বিষয়ে এমনভাবে আলোচনা আমাদের মত পাড়াগেঁয়ের একটু কেমন কেমন ঠেকে ; কিন্তু অনুমান হয়, বসন্তকুমারী মাতৃহীনা, সুতরাং এ সব কথা মাতার মারফত পিতাকে জানাইবার উপায় ছিল না। আর কামাখ্যাবাবু 'নব্যতন্ত্রের লোক', রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'নব্যসমাজের খোলাখুলি মন্ত্রে দীক্ষিত,' সুতরাং তিনি কন্যার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। (২৫)

যাহা হউক, কন্যার প্ররোচনায় কামাখ্যাবাবু সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেও তাঁহার জীবদ্দশায় রুক্মিণীকুমারের কোন হদিস মিলিল না। তবে তিনি যে সূত্র ধরিয়া সন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই পরিণামে 'কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধাদির পর' যখন রাধারাণী আপন বাটীতে চলিয়া গেলেন, তাহারও 'দুই এক বৎসর পরে' সখী বসন্তকুমারীর নিকট হইতে পত্র লইয়া একজন ভদ্রলোক (ইনিই রাধারাণীর আকাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত 'রুক্মিণীকুমার' ছদ্মনামধারী) রাধারাণীর হুজুরে হাজির হইলেন। (৫ম পরিচ্ছেদ।) উভয় সখী এখন আর একত্র বাস করেন না, কিন্তু 'পার্শ্বচারিণী' না হইলেও বসন্তকুমারীর সখী-

(২৫) ইংরেজী নভেলে কন্যা নিজের প্রণয়ের কথাই অনেক সময়.পিতার নিকট বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

প্রীতির কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই, দূরে থাকিয়াও তিনি সখীর ইষ্টসাধনে নিরত।

এই চিঠি পাঠানোর ব্যাপারে একটু রকমফের আছে। সাধারণতঃ নায়ক বা নায়িকা প্রণয়লিপি লেখেন, সখী বা দূতী তাহা বহন করিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেন, ইহাই মামুলি ব্যবস্থা। এখানে সখী নায়কের হইয়া চিঠি লিখিলেন, নায়ক এই সুপারিশ-চিঠির জোরে স্বয়ং দৌত্যে গেলেন। এই এক চিঠিতেই সব কায হাসিল। আসামী এই চিঠি দ্বারা ও আপন একরারে সেনাক্ত হইল। এবং এই চিঠির সূত্রে মামলা তদ্‌বিরের সমস্ত ভার হাকিম স্বহস্তে লইলেন। উকীল-মোক্তারের প্রয়োজন হইল না। অর্থাৎ এমন সন্ধিক্ষণে সখী বসন্তকুমারী ললিতা-বিশাখাদি সখীর ন্যায় বা বৃন্দাদূতীর ন্যায় পার্শ্বে থাকিলে ভাল হইত। এজন্য রাধারাণীর মুখ দিয়া কবি দুই একবার বলাইয়াছেন, 'বসন্তকে যদি আনাইতাম', কিন্তু লজ্জা করিলে চিরজন্মের মত বাঞ্ছিতকে হারাইতে হইবে বুঝিয়া নায়িকা বেশ একটু প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিলেন। ইন্দিরাও এমন অবস্থায় আত্মদোষ-ক্ষালনের জন্য বলিয়াছে, 'তখন আমার কি দায়, মনে করিয়া দেখ।' ('ইন্দিরা', ১২শ পরিচ্ছেদ।)

'ইন্দিরা'য় বিবাহিতার পতি-উদ্ধার, এক্ষেত্রে কুমারীর অভীষ্ট-বরউদ্ধার। প্রণালীও স্বতন্ত্র। সুভাষিণীর সাহায্য ও বসন্তকুমারীর সাহায্য, হারাণীর দৌত্য ও চিত্রার শাঁক-বাজান, ইন্দিরার কীর্ত্তি ও রাধারাণীর কীর্ত্তি, প্রভৃতির তুলনায় সমালোচনা করিলে

প্রণালীর এই প্রভেদ ধরিতে পারা যায়। শেক্‌স্‌পীয়ারের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও এক ধরণের দুইটী জিনিশে ঠিক একই প্রণালী অবলম্বন করেন না। বলা বাহুল্য যে, সুভাষিণীর সাহায্য বসন্তকুমারীর অপেক্ষাও অনেক বেশী। বসন্তকুমারী উকীল-কন্যা, সুভাষিণী উকীল-পত্নী; উকিলের বাড়ীতেই এরূপ তদ্‌বির-কারিণী সাজে, যাহার-তাহার বাড়ীতে সাজে না!

যাক্‌, এসব বাজে কথায় আর কায নাই। প্রেমিকযুগলের মালাবদল হইল, মঙ্গল-শঙ্খ বাজিল, 'শুভ লগ্নে সুতহিবুক যোগে' বিবাহের দিন স্থির হইল। 'তখন বসন্ত আসিল।' (৮ম পরিচ্ছেদ।) উভয় সখীতে নর্ম্মালাপ হইল ('অন্যাঃ পরিহাস-প্রভৃতীনি কর্ম্মাণি'—রসমঞ্জরীর বচন স্মর্ত্তব্য)। 'বসন্ত আসিলে রাধারাণী বলিল, "তোমার কি আক্কেল, ভাই বসন্ত?" বসন্ত বলিল, "কি আক্কেল, ভাই রাধারাণী?" রা। যাকে-তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন?...বসন্ত বলিল, "রাগের কথা ত বটে। সুদ শুদ্ধ দেনা পাওনা বুঝিয়া নেয়, অমন মহা-জনকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তার উপর রাগের কথাটা বটে।" রাধারাণী বলিল, "তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি দিব।" এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার' ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটকীবিদায়ও বাকী রহিল না! হাতে হাতে মিলিল। 'রাধারাণী যে হীরকহার রুক্মিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।' এমন গুণের সখী প্রিয়তমের জন্য রক্ষিত বহুমূল্য হারেরই উপযুক্ত। এই নর্ম্মালাপ

হইতে উভয় সখীর স্নেহ-প্রীতির গভীরতা ও মধুরতা বুঝা যায়। মধুরমিলন-দর্শনে ললিতা সখীর ন্যায় বসন্তকুমারীর কি আনন্দ হইল, সখীকে সুখের কথা বলিয়া রাধারাণীর কি আনন্দ হইল, তাহা অনুভবের ভার সহৃদয় পাঠকের উপর দিয়া কবি বিদায় লইয়াছেন, আমরাও লইলাম।

(১০) 'ইন্দিরা'র অমলা-নির্ম্মলা

'বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত সখীবৃন্দ'-শীর্ষক পরিচ্ছেদে (২৩ পৃঃ) 'পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত' 'ইন্দিরা' সম্বন্ধে বলিয়াছি, 'সুভাষিণীর সখীত্ব এই আখ্যায়িকায় উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। তাহারই (prelude) সূচনা-স্বরূপ অমলা-নির্ম্মলা বালিকাদ্বয়ের সখীত্বের ক্ষুদ্র চিত্র (৫ম পরিচ্ছেদ) গ্রন্থের প্রথম ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে।' যেন সুভাষিণীর অনুপম সখীত্ব এই দুইটী মেয়ের বিমল সখীত্বের সুরের সহিত সুরবাঁধা। (মেয়ে দুইটীর নির্দ্দোষ সখীত্বের ইঙ্গিত অমলা-নির্ম্মলা নাম দুইটীতে লক্ষণীয়।) 'সেইদিন সেই স্থানে দুইটী মেয়ে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের কখনও ভুলিব না। (২৬) মেয়ে দুইটীর বয়স সাত আট বৎসর। দেখিতে বেশ, তবে পরম সুন্দরীও নয়। কিন্তু সাজিয়াছিল ভাল। কাণে দুল, আর হাতে গলায় এক একখানা গহনা। ফুল দিয়া

(২৬) এই সুরে সুর মিলাইয়া ইন্দিরা শেষ কথা বলিয়াছেন, 'আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই, ইহ জন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।' আমরাই কি ভুলিব ?

খোঁপা বেড়িয়াছে। রঙ্গ করা, শিউলী ফুলে ছোবান, দুইখানি কালাপেড়ে কাপড় পরিয়াছে। পায়ে চারিগাছি করিয়া মল আছে। কাঁকালে ছোট ছোট দুইটী কলসী আছে। তাহারা ঘাটের রাণায় নামিবার সময়ে জোয়ারের জলের একটা গান (২৭) *গায়িতে গায়িতে নামিল।* গানটী মনে আছে, মিষ্ট লাগিয়াছিল তাই এখানে লিখিলাম। একজন এক এক পদ গায়, আর একজন দ্বিতীয় পদ গায়। তাহাদের নাম শুনিলাম, অমলা আর নির্ম্মলা।' ছোট্ট ঝরঝরে ছিমছাম সুন্দর ছবিখানির আঁকায় পটুয়ার কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, পাঠকবর্গ মানসনয়নে ছবিখানি প্রত্যক্ষ (visualise) করিতে পারিয়াছেন। মল বাজানর গানটা ইন্দিরার মিষ্ট লাগিলেও উদ্ধৃত করিব না, কেননা অনেক পাঠক হয় ত বসুজপত্নীর মত বিরক্ত হইয়া বলিয়া বসিবেন, 'মরণ আর কি? মল বাজানর আবার গান!' এই অবস্থাভেদে ভালমন্দ লাগার কথা আবার ইন্দিরা আপাতদৃষ্টিতে দূষণীয় ব্যবহারের নিজের বেলায় তুলিয়াছেন। 'যদি কখন মল বাজিয়ে যেতে হয়, তবে সে এখন।' (১৫শ পরিচ্ছেদ)।

(১১) ইন্দিরা ও সুভাষিণী

সখীত্বের (prelude) সূচনা-স্বরূপ এই পরিচ্ছেদের ঠিক পর-পরিচ্ছেদেই ইন্দিরার সহিত সুভাষিণীর সখীত্বের বনিয়াদ-পত্তন।

---

(২৭) ইন্দিরার তখন জোয়ারের মত ভরা যৌবন, এ ইঙ্গিতটুকু প্রণিধান-যোগ্য। 'মল বাজান'র ইঙ্গিত (symbolism) ১৫শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

অবশ্য বড় 'ইন্দিরা'র কথা বলিতেছি, ছোট 'ইন্দিরা'য় অমলা-নির্ম্মলাও নাই, সুভাষিণীও নাই। আমরা বহু কাব্য-নাটকে নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শনে প্রেমে পড়ার (love at first sight) রোম্যান্টিক ঘটনা দেখিয়াছি, এ ক্ষেত্রে নারীতে নারীতে প্রথম-*দর্শনে সখীত্ব-সংঘটনের ব্যাপার। প্রথম-দর্শনে প্রেমে পড়ার* ব্যাপারে যেমন (প্রেমসঞ্চারের আদিকারণ-স্বরূপ) রূপগুণের চিত্র কবিগণ অঙ্কিত করেন, এ ক্ষেত্রেও সেই কারণে সুভাষিণীর রূপবর্ণনার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। যাক্, একবার অমলা-নির্ম্মলার রূপ-বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি, আর সেই সুরে সুরবাঁধা সুভাষিণীর রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিব না। প্রেমের ব্যাপারে যেমন 'অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ', সখীত্ব-ব্যাপারেও সেইরূপ ইন্দিরা 'অনিমেষ-লোচনে' 'সুভো'কে দেখিতে লাগিলেন, ('তার মুখে কি একটা যেন মাখান ছিল, তাহাতে আমাকে যাদু করিয়া ফেলিল') 'সুবো'র মিষ্ট কথা শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন। ('সুভাষিণী' নামের সার্থকতা লক্ষণীয়।) সুভাষিণীও ইন্দিরার 'আঙ্গা হাত' লক্ষ্য করিলেন, 'চোখে জল' ও 'মুখে হাসি'ও দেখিলেন, প্রাণ খুলিয়া অপরিচিতার সহিত আলাপ করিলেন। কর্কশ-ভাষিণী মাসি-মার কথার আঁচ তাঁহার গায়ে লাগিতে দিলেন না, হৃদ্যতা ও কোমলতার প্রভাবে তাঁহাকে দাসীবৃত্তি নহে, লোক-দেখান পাচিকা-বৃত্তি গ্রহণ করিতে রাজী করিলেন, শ্বাশুড়ীকে 'বশ করিয়া লইতে' একটু বেগ পাইতে হইবে তাহাও বলিলেন। একদিন সুভাষিণী ইন্দিরার পরমোপকার করিবেন, হারানিধি

মিলাইবেন, আজ কেবল তাহার সূচনা-স্বরূপ উপস্থিত অস্থিতপঙ্ক হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন, আপাততঃ তাঁহার একটা কিনারা করিয়া দিলেন। পাঠকবর্গ সমগ্র পরিচ্ছেদটি পাঠ করিলে বুঝিবেন, কেমন সরস-মধুর ভাবে উভয়ের সখীত্বের সূত্রপাত হইল।

বাটী পৌঁছিয়া সুভাষিণী চাতুরী খেলিয়া শ্বাশুড়ীকে বুঝাইলেন, বামুনের মেয়ে অপেক্ষা কায়েতের মেয়ে রাঁধুনীই ভাল। 'কুমুদিনী' যুবতী বলিয়া শ্বাশুড়ী তাহাকে রাখিতে একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন হারাণী দ্বারা স্বামীকে ডাকাইয়া তাঁহাকে হুকুম করিলেন ইহাকে রাখাইয়া দিতে হইবে, স্বামীর একবেলা খাওয়া হইল না তাহাতে সুভাষিণী যে কষ্ট পাইলেন, তদপেক্ষা স্বামীর কৌশলে এই রাঁধুনী রাখা হইল তাহাতে বেশী সুখ পাইলেন, আবার এদিকে শ্বাশুড়ীর দুর্ব্বাক্যে 'কুমুদিনী' যখন মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া কাঁদিতে লাগিল তখন তাহার সহিত তিনিও কাঁদিলেন,—ইত্যাদি ব্যাপারে (৭ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত) বুঝা যায় ইহার মধ্যেই নব-পরিচিতার প্রতি তাঁহার কতটা প্রাণের টান হইয়াছে। তাহার পর বুড়ী বাম্‌নী ঈর্ষ্যাবশতঃ 'কুমুদিনী'কে গালি দিলে তজ্জন্য সুভাষিণীর তাহাকে তিরস্কার, শ্বাশুড়ীর পাকা চুল তোলা লইয়া রঙ্গ, সুভাষিণীর ছেলের কল্যাণে 'কুমুদিনী'র সহিত বেহান পাতান, কুমুদিনীর রান্নার কায হাল্কা করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি হইতে (৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ) বুঝা যায় সুভাষিণীর সখীপ্রীতি কত গভীর হইয়াছে। বিস্তৃতিভয়ে এ সকলের পূরা বিবরণ দিলাম না।

নায়িকা নিজেই বলিয়াছেন, 'একটী অমূল্য রত্ন পাইলাম—একটী হিতৈষিণী সখী। দেখিতে লাগিলাম যে সুভাষিণী আমাকে আন্তরিক ভালবাসিতে লাগিল—আপনার ভগিনীর (২৮) সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, আমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করিত।' 'এমন বন্ধু পাইয়া আমার এ দুঃখের দিনে একটু সুখ হইল।' (৯ম পরিচ্ছেদ।)

যাক্, এ সমস্তই গেল গোড়াপত্তন, সখীত্ব-সৌধের প্রথম ধাপ। প্রোষিত-ভর্তৃকা বিরহোৎকণ্ঠিতা 'রাই-উন্মাদিনী' স্বামি-পাগলিনী নায়িকার পতি-উদ্ধারের জন্য সুভাষিণী কতটা করিলেন, তাহার বিবরণ এইবার আরম্ভ হইবে; তাহাতেই সখীত্বের পূরা পরিচয় পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বের এ সমস্ত ব্যাপার তাহারই preparation বা সূত্রপাত।

একদিন 'কুমুদিনী' মুখ ফস্‌কাইয়া 'কালাদিঘীর ডাকাতি' কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল (৯ম পরিচ্ছেদ) কিন্তু তখন কথাটা চাপা দিয়াছিল। পরে সুভাষিণী চাপিয়া ধরিল, 'সেই গল্পটা বলিতে হইবে।' (১০ম পরিচ্ছেদ।) এই কৌশলে গ্রন্থকার নায়িকার প্রমুখাৎ ইন্দিরার জীবনের ইতিহাস সুভাষিণীর অর্থাৎ হিতৈষিণী সখীর গোচর করিয়াছেন। সকল শুনিয়া সুভাষিণী

(২৮) ভগিনীর সহিত তুলনার একটা তাৎপর্য্য আছে। পুস্তকের প্রথম ও শেষ অংশে ইন্দিরার কনিষ্ঠা ভগিনীর সমবেদনার বর্ণনা আছে। ইন্দিরা যখন পিতৃগৃহচ্যুতা প্রবাসিনী, তখন সুভাষিণীই যেন ভগিনী-স্থলাভিষিক্তা।

স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া ইন্দিরার পতি-উদ্ধারের রীতিমত তদ্‌বির লাগাইলেন। প্রথমে পত্র লেখা হইল, ডাকঘরের নাম না থাকাতে কোনও ফল হইল না। সুভাষিণী স্বামী দ্বারা যাহা যাহা করাইয়াছিলেন সবই ইন্দিরাকে বলিলেন। (১১শ পরিচ্ছেদ।) তাহার পর 'আকাশে ফাঁদ পাতিয়া' ইন্দিরার সোণার চাঁদ ধরা পড়িল,—সুভাষিণী তথা রমণবাবুর কৌশলে। (১১শ পরিচ্ছেদ।) এইবার ইন্দিরা 'অভিসারিকা' হইবার জন্য উন্মুখ হইলেন—কিন্তু এ স্বাধীন-যৌবনার লীলা নহে, নিজের পতির নিকট অভিসার। তিনি হারাণীর সাহায্য চাহিলেন, পাইলেন না, অগত্যা সখী সুভাষিণীর শরণ লইলেন; তাঁহার সহিত কথা কহিতে গিয়া বুঝিলেন, এ সব যোগাযোগ সুভাষিণী তথা রমণবাবুর কীর্ত্তি। সুভাষিণী ইন্দিরার অনুরোধে রমণবাবুর মারফত উপেন্দ্রবাবুকে রাত্রিটার জন্য তথায় থাকিতে বলাইলেন। এবং ইন্দিরার উপকারের জন্য হারাণীকে দূতীয়ালি করিতে দিতেও রাজী হইলেন। (১২শ পরিচ্ছেদ।) অন্যত্র সখী প্রয়োজন হইলে দূতীর কার্য্য করেন, এ ক্ষেত্রে পর্দ্দানসীন ভদ্রমহিলার পক্ষে তাহা অবশ্য অসম্ভব, হারাণীকে ইঙ্গিত করিয়াই হিতৈষিণী সখী সুভাষিণীকে ক্ষান্ত থাকিতে হইল। ইহাও দোষের কিনা তাহা বিবেচনা করিবার জন্য 'সুভাষিণী অনেকক্ষণ ভাবিল।' এইরূপে কবি এই রোম্যাণ্টিক ব্যাপারে সুভাষিণীর দোষক্ষালনের জন্য আটঘাট বাঁধিয়া কায করিয়াছেন। (২৯) পর-

(২৯) হারাণীর দোষক্ষালনের জন্য গ্রন্থকার 'পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্লিখিত'

পরিচ্ছেদে (১৩শ পরিচ্ছেদে) দেখা যায়, সুভাষিণী কৌশলে হারাণীকে ইঙ্গিত করিলেন।

সুভাষিণী এই পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু এই ১৩শ পরিচ্ছেদে কবি ইহার উপর এমন একটা সরেস জিনিশ দিয়াছেন, যাহাতে এই সখীত্বের, প্রীতিস্নেহের নিবিড়তা গভীরতা মধুরতা স্ফুটতর হইয়াছে, চিত্র উজ্জ্বলতর হইয়াছে। সুভাষিণীর ঘরে কবাট দিয়া ইন্দিরাকে সাজান (বাসক-সজ্জা), (৩০) আপনার অলঙ্কাররাশি উপহার দেওয়া, ইন্দিরা কিছুতেই রাজি না হইলে তাহাকে ফুলের সাজে সাজান, 'কি জানি ভাই আর যদি তোমার সঙ্গে যদি দেখা না হয়, ভগবান্ তাই করুন,— তাই তোমাকে আজ এ ইয়ার-রিং পরাইব। তুমি যেখানে যখন থাক, এ পরিলে আমাকে তুমি মনে করিবে।' এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসন্নসখীবিরহাকুলা অথচ সখীর প্রাণপতির সহিত আসন্নমিলনের সম্ভাবনায় আনন্দোৎফুল্লা সুভাষিণীর ইন্দিরাকে ইয়ার-রিং পরান, উভয় সখীর কাঁদিতে কাঁদিতে

'ইন্দিরা'য় কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হারাণীর প্রসঙ্গে বুঝাইয়াছি। (৪২-৪৪ পৃঃ।)

(৩০) নিমাইয়ের শাশুড়িকে স্বামীর সহিত দেখা করাইবার সময় সাজানর চেষ্টা ইহার কাছে হা'র মানে। কমলমণিও এমন করিয়া সূর্য্যমুখীকে সাজাইতে যত্ন করিতে পারেন নাই। অতএব এ ক্ষেত্রে ননদ-ভাজ-সম্পর্কের উপরও টেক্কা দিয়াছে।

হাসিতে হাসিতে মিঠে ইয়ারকি, (৩১) আলিঙ্গন, মুখচুম্বন ইত্যাদি মধুর সুন্দর ব্যাপারের চুম্বক বর্ণনা দিয়া এই অনুপম চিত্রের অঙ্গহানি করিব না, পাঠকবর্গকে ১৫শ পরিচ্ছেদের শেষার্দ্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তথাপি একটু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। 'সখীভাবেই কথা কহিতে লাগিল। আমি যে চলিয়া যাইব, সে কথা পাড়িল। চক্ষুতে তার একবিন্দু জল চক চক করিতে লাগিল। এক ফোটা চোখের জল আমার গালে পড়িল। চোক ি লিয়া আমার চোখের জল চাপিয়া, আমি বলিলাম।...তখন সুভাষিণী আমার গলা ধরিল, আমি তার গলা ধরিলাম। গাঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পরস্পরে মুখচুম্বন করিয়া গলা ধরাধরি করিয়া, দুইজনে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। এমন ভালবাসা কি আর হয়? সুভাষিণীর মত আর কি কেহ ভাল বাসিতে জানে? মরিব, কিন্তু সুভাষিণীকে ভুলিব না।' ইহার উপর টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক (impertinence) বেআদবি হইবে।

ইহার পরে, ইন্দিরা স্বহস্তে তদ্বিরের ভার লইলেও সুভাষিণী একেবারে হাল ছাড়িয়া দেন নাই—রমণবাবুর উপেন্দ্রবাবুর বাটী

(৩১) যে সকল পাঠক ইহাতে রসাধিক্য দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, তাঁহাদিগকে পুস্তকের শেষে উদ্ধৃত শেলীর কবিতা 'Rarely, rarely, comest thou, spirit of delight' স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। শেষ বয়সে বড় আনন্দের উচ্ছ্বাসেই বড় স্ফূর্ত্তিতেই গ্রন্থকার আখ্যায়িকাটি 'পুনর্লিখিত' করিয়াছিলেন।

যাতায়াতই তাহার প্রমাণ। (১৭শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ।) ইন্দিরার পতি-উদ্ধারে সুভাষিণীর সখীর কার্য্য ফুরাইল। 'উপসংহারে' ইন্দিরা আবার সুভাষিণীর কথা তুলিয়াছেন, সুভাষিণীর সহিত পত্র-বিনিময় করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, 'সুভাষিণীর জন্য সর্ব্বদা আমার প্রাণ কাঁদিত।' আর একবার মাত্র দুই সখীর দেখা হইয়াছিল—সুভাষিণীর কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে। ইন্দিরার শেষ কথা—'আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।' সহৃদয় পাঠকেরও বোধ হয় এই রায়। এক হিসাবে সুভাষিণীর সখীত্ব কমলমণির সখীত্ব অপেক্ষাও বড়, কেননা কমলমণির সখীত্ব নিজের ভাজের সঙ্গে, আর সুভাষিণীর সখীত্ব নিতান্ত নিষ্পরের সঙ্গে, নব-পরিচিতার (অজ্ঞাতকুলশীলা বলিলেও চলে) সঙ্গে। এই তুলনার কথা ছাড়িয়া দিলেও সুভাষিণী প্রথম শ্রেণীর সখীদিগের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা, তাহা নিঃসন্দেহ। আখ্যানটি মামুলি আদিরসের ব্যাপার হইলেও, সুভাষিণীর আচরণ ও কার্য্য ঠিক বাঁধাধরা (Conventional) প্রণালীতে নহে, সখীত্বের এই রমণীয় আদর্শে কবির যথেষ্ট মৌলিকতা আছে।

এইবার সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সখীত্বের দুইটি চিত্রের (প্রফুল্ল ও দিবা-নিশি, শ্রী ও জয়ন্তী) পরিচয় দিয়া প্রথম শ্রেণীর সখীর বিবরণ শেষ করিব।

(১২) প্রফুল্ল এবং দিবা ও নিশি

এ পর্য্যন্ত যে সকল সখীর কার্য্যকলাপ আলোচনা করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই নায়িকাকে বিরহকালে সান্ত্বনা দিয়াছেন, মিলনের জন্য সাহায্য করিয়াছেন, ইত্যাদি ভাবে যথারীতি সখীর কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু এবারে যে দুইখানি আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ তুলিব, সে দুইখানিতে সখীগণ এইভাবে বাঁধা-ধরা নিয়মে সখীর কার্য্য সাধন করা ছাড়াও নায়িকার অধ্যাত্ম-জীবন-গঠনে, প্রকৃত জ্ঞানলাভে সাহায্য করিয়াছেন। সেই জন্যই সখীদিগের শ্রেণী-বিভাগকালে (২৮ পৃঃ) বলিয়াছি যে, 'দেবী-চৌধুরাণী'তে নিশি ও দিবা এবং 'সীতারামে' জয়ন্তী উচ্চ অঙ্গের সখী।

প্রফুল্ল পিত্রালয়ে বাসকালে মাতার স্নেহ-মমতা ও শ্বশুরালয়ে একরাত্রি বাসের সুবিধার ব্যাপারে সোণার সতীন সাগরের সমবেদনা ও সহায়তা পাইয়াছিল। মাতার মৃত্যুর পর সে ফুলমণি নাপিতানীর সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ফুলমণি 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র অমলার মত ত নহেই, 'বিষবৃক্ষে'র মালতী গোয়ালিনীর অপেক্ষাও জঘন্য প্রকৃতি, প্রফুল্লর সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টার সহায়তা করিয়াছিল। সুতরাং ইহা একেবারে সখীত্বের দিক্ দিয়াই যায় না।

ভবানীঠাকুর যখন প্রফুল্লের নবজীবন-গঠনের জন্য তাহাকে শিক্ষা দিবেন স্থির করিলেন, তখন তিনি তাহার বয়স্যা, সহচারিণী অথচ শিক্ষয়িত্রী-হিসাবে নিজ শিষ্যা নিশিকে তাহার কাছে

রাখিলেন ; বয়সে প্রফুল্লের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড় হইলেও, সে বয়স্যার মতই রঙ্গ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিল। তাহার পর সে ভবানীঠাকুরের শিক্ষামত প্রফুল্লকে লেক্‌চার দিতে আরম্ভ করিল ; কিন্তু সত্বরই বুঝা গেল যে, সে শুধু শুষ্ক জ্ঞানের ব্যাপারী নহে, দরদের দরদীও বটে। যখন প্রফুল্ল আবেগের সহিত স্বামীর উল্লেখ করিল এবং তাহার 'চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল' তখন 'নিশি বলিল, "বুঝিয়াছি বোন্—তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।" তখন নিশি, 'প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার চক্ষের জল মুছাইল।' (১ম খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ।) প্রথম পরিচয়েই নিশি প্রফুল্লের সমবেদনাময়ী সখীর স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ('বোন্' সম্বোধনে হৃদ্যতার পরিচয় পরিস্ফুট।)

এই খণ্ডের ১৫শ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, প্রফুল্লের প্রথম শিক্ষা নিশি ঠাকুরাণীর হাতে হইল, তার পর 'পাঠক ঠাকুর' সে ভার লইলেন, নিশি সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে সেই শিক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ডে—প্রফুল্ল দেবী-চৌধুরাণী হইয়াছে। সাগরের মান-ভঞ্জনের জন্য ব্রজেশ্বরকে গ্রেপ্তার করার পর যখন পর্দ্দার আড়াল হইতে ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে কহিতে দেবীচৌধুরাণীর গলাটা ধরাধরা হইল, তখন 'নিশি ঠাকুরাণী' দেবীচৌধুরাণীর কাছে আসিয়া বসিল। নিশি একটা সমবেদনার কথা কহিলেই 'দেবীর চক্ষে জল আর থাকিল না।'—দেবী তখন সখীকে

ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহার ভার দিলেন। বুঝা গেল, নিশি দেবীর সমবেদনাময়ী সাহায্যকারিণী সখীর কার্য্য করিল। "তুই কথা ক। সব জানিস ত।" দেবীর এই কথায় বুঝা গেল, নিশি 'বিশ্বাস-বিশ্রাম-কারিণী।' (২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।) ৭ম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, নিশি দেবীর ইঙ্গিতে ব্রজেশ্বর-সাগর-ঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত। আবার সে কার্য্য-সমাধার পর নিশি ব্রজেশ্বরকে রাণী দেখাইবার জন্য 'আর এক কামরায় লইয়া গেল।' অর্থাৎ সখী মামুলী প্রথায় নায়ক-নায়িকার মিলন-সংঘটন করিল। ৮ম পরিচ্ছেদে 'ব্রজেশ্বরকে পৌছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল।' (গিরিজায়াও এইরূপ মৃণালিনীকে হেমচন্দ্রের নিকট পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।) তাহার পর ব্রজেশ্বরকে বিদায় দিয়া 'দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে।' নিশি আসিয়া এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া 'তাহাকে উঠাইয়া বসাইল—চোখের জল মুছাইয়া দিল—সুস্থির করিল,' —উপদেশ ও সান্ত্বনা দিল। (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)। আবার সে সমবেদনাময়ী সান্ত্বনাদায়িনী সখী।

নিশির কথা এতক্ষণ ধরিয়া বলিলাম। এইবার দিবার কথাও তুলিতে হইবে। ১ম খণ্ডের ১৩শ পরিচ্ছেদে নিশি একবার তাহার নাম করিয়াছে, প্রফুল্লের সহিত তাহার আলাপ করিয়া দিবে বলিয়াছে, কিন্তু তখনকার মত আর তাহার প্রসঙ্গ দেখা যায় না। ২য় খণ্ডের ১০ম পরিচ্ছেদে দেবী 'একজন মাত্র স্ত্রীলোক' দিবাকে সঙ্গে লইয়া বজরা হইতে

নামিয়া তীরে তীরে গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। কিন্তু দেবী 'একটা গাছের তলায় পৌঁছিয়া পরিচারিকাকে বলিল,—"দিবা, তুই এইখানে ব'স্। আমি আসিতেছি।"' বুঝা গেল, দিবা 'পরিচারিকা'; নিশি অপেক্ষা নিকৃষ্ট পদবীর, সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্রীও নহে, নিশির মত তাহার সহিত দেবীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নহে।

গ্রন্থকার এই ভাবে দিবার পরিচয় দিয়া ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে নিশি ও দিবা উভয়কে একত্র দেবীর পাশে বসাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন, 'দিবা অশিক্ষিতা,' তাহার প্রশ্নের ও উত্তরের ভঙ্গীতেও ইহা সপ্রমাণ হয়। পক্ষান্তরে 'নিশি প্রফুল্লের একপ্রকার সহাধ্যায়িনী ছিল,' আবার শিক্ষয়িত্রীও ছিল। নিশি ও দিবার মধ্যে এরূপ প্রভেদ থাকিলেও উভয়েরই দেবীর প্রতি গভীর প্রীতি-স্নেহ ছিল। এই পরিচ্ছেদেই দেখা যায়, যখন দেবী স্বামি-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ও শ্বশুরের অপকার-নিবারণের উদ্দেশ্যে নিজের বিপদ্ ডাকিয়া লইল, ইংরেজের কাছে ধরা দিতে সঙ্কল্প করিল, তখন নিশি ও দিবা উভয়েই সমান আগ্রহের সহিত তাহাকে এই সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল (২য় পরিচ্ছেদ) এবং তাহার পর নিশি পুনরায় দেবীকে বুঝাইল (৪র্থ পরিচ্ছেদ)। উভয়েই দেবী সাজিয়া সাহেবের চোখে ধূলা দেওয়ার চেষ্টা করিল ও গোয়েন্দাকে আনিতে বলিল। (ষষ্ঠ ও ৭ম পরিচ্ছেদ।) দেবী তাহাদিগকে কর্ত্তব্য উপদেশ দিল, তাহারা 'বাহিরে আসিয়া

দাঁড়ী মাঝিদিগকে চুপি চুপি কি বলিয়া গেল' (৫ম পরিচ্ছেদ)। প্রফুল্ল নিজের বিপদ্ আহ্বান করিয়া সখীদ্বয়কে বাঁচাইবার জন্য ব্রজেশ্বরকে অনুরোধ করিল। ('আমার দুইটী সখী এই নৌকায় আছে। তারা বড় গুণবতী, আমিও তাহাদের বড় ভালবাসি। তোমার নৌকায় তাহাদের লইয়া যাইও।') ইহা হইতে দেবীর স্নেহের গভীরতাও বুঝা যায়। গোয়েন্দা (শ্বশুর) আসিলে সে তাঁহার অভ্যর্থনার ভার সখীদ্বয়ের উপর দিল। বুদ্ধিমতী নিশি কিরূপে হরবল্লভকে ভয় দেখাইয়া প্রফুল্লের কার্য্য-উদ্ধার করিল তাহার সরস বর্ণনা ৮ম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। ইহা লইয়া নিশি দেবীর সহিত একটু রঙ্গ করিতেও ছাড়িল না। ('পরিহাস' সখীর অন্যতম লক্ষণ।)

৯ম ও ১১শ পরিচ্ছেদে উভয় সখীতে আসন্ন বিচ্ছেদ-কাতর হইয়া গাঢ় স্নেহ-প্রীতি-সমবেদনার সহিত তাহার সহিত আলাপ করিল। প্রফুল্লও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাহাদিগকে স্নেহ-উপহার দিলেন। সখীত্রয়ের বিদায় দৃশ্য বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। 'দিবা ও নিশি সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের ঘাট পর্য্যন্ত চলিল। প্রফুল্ল দিবা ও নিশিকে সব (বহুমূল্য আসবাব ও অলঙ্কার) দিলেন। নিশি কতকগুলি বহুমূল্য রত্নাভরণে প্রফুল্লকে সাজাইতে লাগিল।...দেবীকে নিরাভরণা দেখিয়া সেইগুলি পরাইল। তার পর আর কোন কাজ নাই, কাজেই তিনজনে কাঁদিতে বসিল। নিশি গহনা পরাইবার সময়েই সুর তুলিয়াছিল; দিবা তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরিলেন। তার পর পোঁ সানাই ছাপাইয়া

উঠিল। প্রফুল্লও কাঁদিল—না কাঁদিবার কথা কি? তিনজনের আন্তরিক ভালবাসা ছিল; প্রফুল্লর মন আহ্লাদে ভরা, কাজেই প্রফুল্ল অনেক নরম গেল। নিশিও দেখিল যে, প্রফুল্লর মন সুখে ভরা; নিশিও সে সুখে সুখী হইল, (৩২) কান্নায় সেও একটু নরম গেল। সে বিষয়ে যাহার যে ত্রুটি হইল, দিবা ঠাকুরাণী তাহা সারিয়া লইলেন।' [নিশি ও দিবার এই চরিত্রের প্রভেদ প্রণিধানযোগ্য।) দিবা ও নিশির পায়ের ধূলা লইয়া, প্রফুল্ল তাহাদিগের কাছে বিদায় লইল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। (১১শ পরিচ্ছেদ।) এই যুগলসখীর আবির্ভাব আমাদিগকে শকুন্তলার যুগলসখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

গার্হস্থ্য-জীবনে আবার সোণার সতীন সাগর প্রফুল্লের সমবেদনাময়ী সখী হইবে, সুতরাং মধ্যজীবনের সখীদ্বয়ের আর প্রয়োজন নাই।

(১৩) শ্রী ও জয়ন্তী

মাতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরেই ভ্রাতা বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে শ্রী অগত্যা (পাঁচকড়ির মার সাহায্যে) স্বামী সীতারামের শরণ লইয়াছিল; সীতারামের সহায়তায় ভ্রাতার বিপদ্ কাটিল; কিন্তু শ্রী সীতারামের নিকট জ্যোতিষীর গণনার বৃত্তান্ত শুনিয়া 'প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী' হইবার আশঙ্কায় স্বামি-সহবাসের আশায় জলাঞ্জলি দিল

(৩২) ২য় পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সখীর লক্ষণ স্মর্ত্তব্য।—

'নিজ সখী দুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম।'—গোবিন্দদাস।

'শ্রীমতীর সুখের সুখী দুখের সে দুখী'।—'ভক্তমাল।'

এবং ভ্রাতা ও পতি উভয়েরই আশ্রয় ছাড়িয়া অকূলে ঝাঁপ দিল। এই সঙ্কল্প স্থিরীকরণে সে স্বাবলম্বনের উপর নির্ভরশীলা। পরে জয়ন্তীর সহিত কথোপকথন হইতে জানা যায় (১ম খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ) যে শ্রী শ্রীক্ষেত্রের পথে পাণ্ডার অত্যাচারের ভয়ে যাত্রীর দল ছাড়িয়া একাকিনী নিঃসহায়া, আত্মহত্যায় প্রস্তুত, এই অসহায় অবস্থায় তাহার পার্শ্বচারিণী সখী মিলিল—সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী যুটিল। (পূর্ব্বে যাত্রীর দলে থাকিতে শ্রীর জয়ন্তীর সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তখন শ্রীর সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং তখন উভয়ের মিলন ঘটে নাই।)

'শ্রীর মন টলিল। শ্রী দেখিতেছিল, ভিক্ষা এবং মৃত্যু, এই দুই ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গ যেন উপায়ান্তর হইতে পারে বোধ হইল।' (১ম খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।) সুতরাং সন্ন্যাসিনী যখন তাহাকে সঙ্গিনী হইতে অনুরোধ করিল তখন শ্রী একটু তর্কের পর সম্মত হইল। 'সন্ন্যাসিনী বিরাগিণী প্রব্রজিতা, অনেক দিন হইতে তাহার সুহৃদ্ নাই; আজ একজন সমবয়স্কা প্রব্রজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইল।' (১ম খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ।)

প্রথমে উভয়ে উভয়কেই মাতৃসম্বোধন করিল, কিন্তু দুই দিনের পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়িলে তাহারা 'বহিন' বলিয়া গেল। (৩৩) 'স্নেহসম্বোধনে শ্রীর প্রাণ একটু জুড়াইল।

(৩৩) নিশিও প্রফুল্লকে কখন কখন মাতৃসম্বোধন করিয়াছে, কেননা প্রফুল্ল দেবী-চৌধুরাণী অর্থাৎ রাণী-মা। ('দেবী চৌধুরাণী' ২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ও ৩য় খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

দুইদিন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থাকিয়া, শ্রী তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ দুইদিন মা! বাছা! বলিয়া কথা হইতেছিল —কেননা সন্ন্যাসিনী শ্রীর পূজনীয়া। সন্ন্যাসিনী সে সম্বোধন ছাড়িয়া বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল, যে সে'ও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।' (১ম খণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদ।)

উভয়ে সমবয়স্কা, প্রথম আলাপেই উভয়ের মনে সখী-প্রীতির সঞ্চার হইল, জয়ন্তী প্রথম হইতে সমবেদনার সহিত কথা কহিল, শ্রীকে আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিল, একটু নর্ম্মালাপের সুরে শ্রীর মনের কথা জানিয়া লইল, তাহাকে সৎপরামর্শ দিল ও তাহার সহায়িনী সঙ্গিনী হইল। (১ম খণ্ড ১১ শ পরিচ্ছেদ।) পর-পরিচ্ছেদে শ্রীর হাত দেখার প্রস্তাবে জয়ন্তী তাহাকে (১ম খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ) জ্যোতিষী গঙ্গাধর স্বামীর নিকট লইয়া গেল; বুঝা গেল, জয়ন্তী সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীকে সাহায্য করিতেছে। পর পরিচ্ছেদে দেখা যায়, উভয়ের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, শ্রীর সমগ্র ইতিহাস জয়ন্তী এখন জানিল, এবং তাহার নবজীবন-গঠনের চেষ্টায় জয়ন্তী (নিশির মত) শ্রীকে লেক্‌চার দিতে আরম্ভ করিল। (অধ্যাত্ম-জীবনের পথে নিশি অপেক্ষা জয়ন্তী বোধ হয় অধিক অগ্রসর।) এখন হইতে শ্রী জয়ন্তীর শিষ্যা, অথচ জয়ন্তী আবার শ্রীর বয়স্যা সখী। শ্রী প্রাণ খুলিয়া আবেগ-ভরে তাহাকে গভীর স্বামি-প্রেমের কথা বলিল, 'শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। জয়ন্তীরও চক্ষু ছল ছল করিল।'

(১ম খণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদ।) বুঝা গেল, শ্রী জয়ন্তীকে আপনার জন অন্তরঙ্গ সখী বলিয়া জানিয়াছে, তাই তাহাকে সকল কথা জানাইয়া মনের ভার লঘু করিতেছে।

'জানালে আপন জনে মনের যাতনা।
ব্যথিত হৃদয় পায় অনেক সান্ত্বনা ॥'

আবার জয়ন্তীও নিশির মত ('দেবী চৌধুরাণী', ১ম খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ) সমবেদনাময়ী সখী। এইখানে প্রথম খণ্ডের শেষ। দেখা গেল, প্রথম খণ্ডের শেষেই উভয়ের সখীত্ব-বন্ধন নিবিড় হইয়াছে।

গঙ্গাধর স্বামীর পূর্ব্ব-আদেশ-মত জয়ন্তী এক বৎসর পরে (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ) আবার শ্রীকে সঙ্গে করিয়া মহাপুরুষের নিকট আসিয়া উপস্থিত। মহাপুরুষ শ্রীর অসাক্ষাতে জয়ন্তীকে জানাইলেন যে শ্রীর পতি-সন্দর্শনের সময় আসিয়াছে ও জয়ন্তীকে তাহার সঙ্গে যাইতে হইবে। জয়ন্তী শ্রীকে সেই অনুমতি জানাইল, তাহার সহিত স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, উভয়ে অনেক জ্ঞানের কথা হইল, শ্রী মনের কথা জয়ন্তীকে খুলিয়া বলিল, সে এখন পূরাপূরি জয়ন্তীর শিষ্যা। (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।)

উভয়ে ভৈরবী-বেশে সীতারামের রাজধানীতে আসিল, জয়ন্তী সীতারামের রাজ্যরক্ষায় প্রভূত সাহায্য করিল (সে সব এই প্রসঙ্গে অবান্তর কথা), এবং সীতারামের আশা মিটিবে তাঁহাকে এই আশ্বাস দিল (২য় খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ)। এই খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে (১৭শ) জয়ন্তী শ্রীকে বলিল 'এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে

সাক্ষাৎ কর।' কিন্তু শ্রী সাহস করিল না। যাহা হউক, বুঝা গেল এক্ষেত্রেও জয়ন্তী শ্রীর শুভানুধ্যায়িনী সৎপরামর্শদায়িনী সখী, শ্রীও তাহার কাছে কোন কথা লুকায় না।

তৃতীয় খণ্ডে জয়ন্তী শ্রীকে সুখী করিবার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত গঙ্গারামকে মুক্ত করিল এবং শ্রীর সহিত সীতারামের মিলন ঘটাইয়া দিল। (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) এত অধ্যাত্মতত্ত্বের মধ্যেও জয়ন্তী সখীর কর্ত্তব্য ভুলে নাই। তাহার পর শ্রী অনেক দিন 'চিত্ত-বিশ্রামে' বাস করার পর জয়ন্তী শ্রীকে আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিল ও তাহার জন্য নিজেকে বিপন্ন করিল (১৬শ পরিচ্ছেদ)। জয়ন্তী সখীর ধরণে একটু পরিহাস করিল, তাহার পর তত্ত্ব-উপদেশ দিল এবং শ্রীর ইচ্ছা পূর্ণ করিল। এখানেও সে 'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী' শুভানুধ্যায়িনা সৎপরামর্শদায়িনী 'নায়িকাসহায়িনী'। জয়ন্তীর উপর শ্রীর 'অনন্ত বিশ্বাস।' এই উদ্ধার-কার্য্যের ফলে শ্রীর জন্য জয়ন্তী সীতারামের হস্তে নিদারুণ অপমান সহ্য করিল (১৮শ পরিচ্ছেদ), ইহা তাহার সখী-প্রীতির উজ্জ্বলতম নিদর্শন। (সে বীভৎস ব্যাপারের আর বর্ণনা করিব না।)

এই লাঞ্ছনাতেও জয়ন্তী শ্রীর মুখ চাহিয়া অত্যাচারী সীতারামের উদ্ধারকামা হইয়া 'শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল, শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল', আবার তাহাকে স্বামিসেবা করিতে প্রবৃত্তি দিল, শ্রীও সম্মত হইল (২০শ পরিচ্ছেদ)। উভয়ে একাভিসন্ধি হইয়া সীতারামের রাজধানীতে আসিল (২১শ

পরিচ্ছেদ) এবং সীতারামের সর্ব্বনাশের সময় তাঁহার (পার্থিব নহে) পারমার্থিক উপকার সাধন করিল (২৩শ পরিচ্ছেদ)। বলা বাহুল্য, জয়ন্তী শ্রীর মুখ চাহিয়া সীতারামের মঙ্গল সাধন করিল।

জয়ন্তী শ্রীর মুখ চাহিয়া (গোলন্দাজ-বেশী) গঙ্গারামকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল, সীতারাম তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন (২৩শ পরিচ্ছেদ)। তাহার পর 'গোলন্দাজ কে ?' ইহা লইয়' শ্রী ও জয়ন্তীতে কথা হইল, সন্দেহ মিটাইবার জন্য উভয়ে রণক্ষেত্রে গেল, শ্রী অনেকক্ষণ পরে চিনিল—'গঙ্গারাম বটে।' 'শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "বহিন্—যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে ? যাই হউক উঁহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া উঁহার দাহ করা যাক আইস।" তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।' (২৪শ পরিচ্ছেদ।) ভ্রাতৃশোকাতুরা শ্রীর সহিত সমবেদনা-প্রকাশ ও তাহাকে সাহায্য-দান জয়ন্তীর সখীত্বের শেষ কার্য্য। ইহার পরে উভয়ে একত্র লোকালয় ত্যাগ করিল। এতক্ষণে কবি সখীদ্বয়ের সম্পূর্ণ একাত্মতা বিধান করিলেন। প্রফুল্ল শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং শিক্ষা-জীবনের সঙ্গিনীদ্বয়ের সহিত তাহার ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল। পক্ষান্তরে শ্রী সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া সংসার ছাড়িল, সুতরাং জয়ন্তীর সহিত তাহার সখীত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর হইল। প্রফুল্ল ও শ্রীর চরিত্রগত পার্থক্যের জন্যই সখীসম্বন্ধে এই প্রভেদ।

শেষ কথা

এই সুদীর্ঘ আলোচনা হইতে বুঝা গেল, [illegible] [illegible] মামুলি প্রথায় বহুস্থলে 'নায়িকা-সহায়িনী' সখীর অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহার অনেকগুলি স্থলে সখীদের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মণিমালিনী, গিরিজায়া, কুল্‌সম্‌, নির্ম্মল-কুমারী, বসন্তকুমারী, সুভাষিণী, নিশি, জয়ন্তী, এই অষ্ট সখীর উজ্জ্বল চিত্রের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কোনও কোনও স্থলে কবি মামুলি প্রথার অনুসরণ করিয়াও যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন, কোনও কোনও স্থলে নূতন আদর্শে সখীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তত্তৎস্থলে তাহাও বুঝাইয়াছি। উপসংহার-কালে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আবার কতকগুলি স্থলে স্নেহময়ী ভগিনী, ননন্দা বা সপত্নী সখীস্থানীয়া, যথাস্থানে (১২ পৃঃ) তাহারও আভাস দিয়াছি। আশা করি, এই আলোচনা হইতে পাঠকবর্গ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিচিত্র লীলার আংশিক পরিচয় পাইয়া প্রীত হইবেন।

সমাপ্ত

☞ এই প্রবন্ধাবলি 'ভারতবর্ষে' (আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র, ১৩২৫ ও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

কাব্যসুধা (বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা)	...	১৲
কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব (২য় সংস্করণ)	...	॥০
ফোয়ারা (৩য় সংস্করণ) ...	...	১।০
পাগলা ঝোরা (২য় সংস্করণ, যন্ত্রস্থ)	...	২৲
প্রেমের কথা ...	...	॥০
অনুপ্রাস ...	...	॥০
ককারের অহঙ্কার ...	...	।/০
ব্যাকরণ-বিভীষিকা (২য় সংস্করণ)	...	।/০
বাণান-সমস্যা (২য় সংস্করণ) ...	...	।০
সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা ...	...	৵০

বাঙ্গালাদেশের ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাইজের জন্য অনুমোদিত

শিশুপাঠ্য

ছড়া ও গল্প (৪র্থ সংস্করণ) ...	...	।৵০
আহ্লাদে আটখানা (৩য় সংস্করণ)	...	॥০
রসকরা	...	॥০
সাত নদী (৮খানি তিন-রঙ্গা ছবি আছে)	...	॥৵০